শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার দ্বিমাসিক

আল-আমীন বার্তা

জানুয়ারি-জুন ২০১৮

খবরে আল-আমীন মিশন: ১৯৯৮-২০১৭

- একটি পিছিয়ে পড়া সমাজকে টেনে তুলছে আল-আমীন মিশন। —অশোককুমার কুণ্ডু, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪.০৮.১৯৯৮।
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের খুঁজে চলেছে আল-আমীন মিশন। —অশোককুমার কুণ্ডু, আনন্দমেলা, ০১.০৩.২০০০।
- বাঙালি মুসলিমদের শিক্ষায় নবজাগরণের নয়া তীর্থ। —আবদুর রাউফ, সংবাদ প্রতিদিন, ১৪.১২.২০০০।
- বিদ্যার অভিনব সূর্যোদয়: আধুনিক শিক্ষাখাতে যাকাত ও ফিতরার অর্থ-সম্পদের ব্যবহার প্রায় দেখাই যায় না। এদিক থেকে আল-আমীন মিশনের আরম্ভ, নির্মাণ ও বিস্তার অবশ্যই একটি নিঃশব্দ বিপ্লব। —বাহারউদ্দিন, আজকাল (রবিবাসর), ১৮.১১.২০০১।
- দানের টাকায় আধুনিক শিক্ষা, একটি স্বপ্নের নীরব অভিযান। —মিলন দত্ত, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪.০২.২০০২।
- Mainstream reform from within –Madhumita Bhattacharyya, The Telegraph, 10.09.2002.
- একটি স্কুলের ভর্তিপরীক্ষা, নবজীবনের প্রবেশ পথ। —একরাম আলি, আজকাল, ০৪.০৪.২০০৩।
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত। —সম্পাদকীয়, কালান্তর, ০৯.০৮.২০০৩।
- ইচ্ছে হাওয়ায়। —কবীর সুমন, আজকাল, ১৭.০৭.২০০৪।
- ধর্ম, সমাজ, ঘেরাটোপ—ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে। —বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২.১২.২০০৫।
- School Bells Echo Amidst Paddy Fields: Al-Ameen Mission has today become a model for excellent education standards. –Islamic Voice, February 2006.
- Hope for Hopeless: It's school that gives those children a chance who have not a penny of their name –Nisha Lahiri, The Telegraph, 02.06.2006.
- রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার নবজাগরণ। —অঞ্জন বসু, সংবাদ প্রতিদিন, ০৩.০২.২০০৭।
- আল-আমীন মিশন—প্রতিশ্রুতির অন্য নাম। —এস এম সামসুদ্দিন, একদিন, ০২.০৩.২০০৭।
- মূল স্রোতে। —সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮.০৫.২০০৭।
- Mission Launchpad for poor student –Jhimli Mukherjee, The Times of India, 01.06.2007.
- আল-আমীনের সাফল্য: আত্মশক্তিতে ভরপুর বাঙালি মুসলমানরা।— শেখ ইবাদুল ইসলাম, একদিন, ০১.০৬.২০০৭।
- আল-আমীন মিশন: স্বপ্ন পূরণের মাইল ফলক। —মহ. সাদউদ্দিন, কালান্তর (রবিবারের পাতা), ১০.০৬.২০০৭।
- Sustained by Donations, Al-Ameen Mission is providing mainstream learning to the community's children. Rajdeep Datta Roy, Live mint.com, The Wall Street Journal, 18.12.2007.
- Mission Possible: It has scripted many a turnaround: picking up poor kids, tutoring them and seeing them off on the road of success. –Jayanta Gupta & Subhro Maitra, The Times of India, 30.04.2008.
- Deprived kids blaze trail of glory: House of dreams. The Al-Ameen Mission has been nurturing talent from underprivileged Muslim Families. –Sumati Yengkhom, The Times of India, 28.05.2010.
- Al-Ameen Mission-Shelter & Studies. –Bibhas Bhattacharyya, Hindusthan Times, 23.06.2010.
- গৌরব, লজ্জা— সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯.০৫.২০১২।
- A mission that changes lives, helps dreams soar. –The Times of India, 28.05.2013.
- নতুন তারার জন্ম আল-আমিনে। —কৌশিক সরকার, এই সময়, ০৪.০৬.২০১৩।
- সমাজের অন্দর থেকে। —তাজুদ্দিন আহ্‌মেদ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১.০৯.২০১৩।
- আল-আমীন মিশন এক মরূদ্যান, এক অনুঘটক। —একরামূল হক শেখ, স্বভূমি, ০৯.০৩.২০১৪।
- দারিদ্র্য জয় করে উজ্জ্বল আল-আমীন মিশন। —সোমনাথ মণ্ডল, আজকাল, ৩১.০৫.২০১৪।
- আল-আমীনের ছায়ায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ওঁরা।—মনিরুল শেখ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫.০৫.২০১৫।
- Al-Ameen takes mission to Ranchi and Assam. –Sumati Yengkhom, The Times of India, 19.06.2015.
- আল-আমীন মিশন: পায়ে পায়ে তিন দশক। —এস এম সিরাজুল ইসলাম, একদিন, ০৯.০৮.২০১৬।
- Al-Ameen Mission: West Bengal – Reforming the Society Silently. –Dr. Sadath Khan, Islamic Voice, December 2016.
- Minority Medicine: Muslims of Bengal are embracing education to break free from a certain way of life and age-old stereotyping. –Sonia Sarkar, The Telegraph, 10.09.2017.

আল-আমীন বার্তা

পৌষ ১৪২৪-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ | জানুয়ারি-জুন ২০১৮
জমাদিউল আওয়াল-শওয়াল ১৪৩৯ • অষ্টম বর্ষ • যুগ্ম সংখ্যা

পরামর্শ পরিষদ
একরাম আলি সেখ মহম্মদ হাসান সেখ মারুফ আজম
এম আব্দুল হাসেম মাইনুদ্দিন আহমেদ

সম্পাদক
এম নুরুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
শেখ হাফিজুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী
দিলদার হোসেন একরামুল হক শেখ
আসাদুল ইসলাম সেলিম মল্লিক

জনসংযোগ
মহম্মদ আসরাফুল হোসেন মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস
সেখ মোমিনুর রহমান তসলিম আরিফ
সেখ মহম্মদ ইস্রাফিল মহম্মদ মহসীন আলি

ইন্টারনেট সংস্করণ
আব্দুল কাইয়ুম বিশ্বাস

বর্ণস্থাপন এবং গ্রাফিক্স
মহম্মদ গোলাম কিবরীয়া

প্রচ্ছদ
৯ ডিসেম্বর ১৯৬১। পটভূমি দিল্লি। এশীয় ইতিহাস কংগ্রেসে ভারতের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবীর (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়)। পাশে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কথা বলছেন সম্মেলনে উপস্থিত দেশ-বিদেশের ইতিহাসবিদদের সঙ্গে। সৌজন্য: টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপ।

আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম কর্তৃক প্লট নং ডি জে ৪/৯, অ্যাকশন এরিয়া ১, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মন্ড আর্ট প্রেস ৩৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯ থেকে মুদ্রিত।

মতামত এবং লেখা পাঠাবার ঠিকানা
নির্বাহী সম্পাদক, আল-আমীন বার্তা, ৫৩বি ইলিয়ট রোড,
কলকাতা ৭০০ ০১৬।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০ টাকা, সডাক ২০০ টাকা • **প্রতি সংখ্যা** ২৫ টাকা

দূরভাষ ০৩৩-২২২৯ ৩৭৬৯, ৭৪৭৯০ ২০০৭৬
e-mail: alameenbarta@gmail.com
weblink: www.alameenmission.org
facebook.com/alameen.barta

অনন্য ব্যক্তিত্ব

মুক্তচিন্তার মানুষ ছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর। তাঁর সমসময়ে তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। সেই বিস্মৃতপ্রায় মানুষটি বিষয়ে লিখেছেন

কাজি তাজউদ্দিন

বিস্মিত বিস্মরণ
হুমায়ুন কবীর

৬ পাতায়

স্মরণ

মানুষের মৃত্যু হলেও মানব থেকে যাবে— এই প্রত্যয় থেকে ক্ষণিকের জন্যও সরে যায়নি তাঁর লিখনাবলী। তাঁকে স্মরণ করার সময়ে আমরা পীড়িত হয়েছি এই ভেবে যে, তিনি অকালে চলে গেলেন। এই বিভাগে তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে দুটি নিবন্ধ রয়েছে, লিখেছেন

নলিনী বেরা এবং গোলাম রাশিদ

শেকড়সন্ধানী সোহরাব

১১ পাতায়

উজ্জ্বল প্রাক্তনী

গত তেত্তিরিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অথবা গবেষণায় ব্যস্ত সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে। এই সংখ্যায় চিকিৎসক সানোয়ার সেখ

লিখেছেন আসাদুল ইসলাম

১৯ পাতায়

জীবনের গল্প, গল্পের জীবন

বঙ্গাদর্শন

কথায় আছে, গাঁয়ে আর মায়ে সমান। দুই যে দূরে সবুজ রেখা, ওই দিকেই গেছে রেললাইন, রাজ্য সড়ক, পঞ্চায়েতের রাস্তা। কোথাও-বা আলপথ। সব পথই গেছে কোনো-না-কোনো গাঁয়ে। কেননা, বাংলায় গ্রামই এখনও সংখ্যায় অধিক।

লিখেছেন অশোককুমার কুণ্ডু

২৩ পাতায়

প্রবাসের চিঠি, আত্মজাকে

শিখরদেশ

প্রতি বছর মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক-সহ নানা পরীক্ষা হয়। ফল বেরোলে সংবাদপত্রে নাম ওঠে কোনো কোনো ছাত্র-ছাত্রীর। র‍্যাঙ্ক করা ছাত্র-ছাত্রীর সাফল্যের পেছনে কী রসায়ন কাজ করে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই-বা কী ভূমিকা? এই সংখ্যায় বলছে ২০১৭-র নিট মেডিকেলে অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্ক ১৪৪৪৫, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৩৪১। (আল-আমীনের মধ্যে প্রথম)

আশিফ ইকবাল হোসেন

মধ্যমেধার পড়ুয়াও এখানে ভালো ফল করে

২৭ পাতায়

অন্যান্য বিভাগ

পাঠকনামা	০৪
সম্পাদকীয়	০৫
মুক্তভাষ	৩০
রত্ন চতুষ্টয়	৩২
বিশ্ববিচিত্রা	৩৪
সাত-পাঁচ	৩৭
মিশন সমাচার	৪৫
আমাদের পাতা	৫৫

তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে প্রজ্ঞা প্রদান করা হয়, তাকে নিশ্চয় প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। (অংশ)

— আল-কোরআন, সুরা বাকারাহ্, আয়াত ২৬৯

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— আমি শুনেছি, নবি করিম (স.) বলেছেন, যে-ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা তার মৃত্যুর পরে সুনাম থাকুক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করে।

— সহিহ্ বুখারি শরিফ, হাদিস সংখ্যা ১৯৩৭

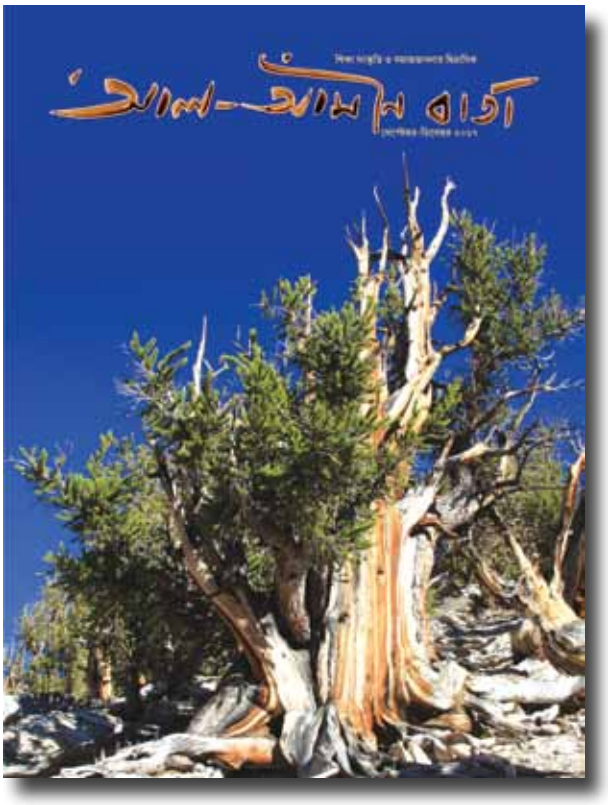

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে অতনুমিথুন মণ্ডলের তথ্যানুগ, সুখপাঠ্য এবং মননশীল 'মহাবিদ্রোহের ক্ষণে যার অভ্যুদয়' পড়ে সমৃদ্ধ হলাম। ঐতিহ্যশালী এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকের তালিকায় কয়েক জন সংখ্যালঘুর নাম থাকলে খুবই সুন্দর হত। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫—১৯৬৯) সেইরকমই একজন। সংস্কৃত পাঠের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক সত্যব্রত সামশ্রামীর অসম্মতি ইতিহাসে খুবই চর্চিত বিষয়। তার আগেও তাঁকে সংস্কৃতে ভর্তি করতে কলেজগুলি ইচ্ছুক ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় তিনি ভর্তি হন কলকাতা সিটি কলেজে। এক বছর পর বেদের পত্রে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সংস্কৃতে স্নাতক প্রথম মুসলমান ছাত্র হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। পরে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস করেন। বাঙালি মুসলমান ছেলেদের মধ্যে তিনিই প্রথম সংস্কৃত নিয়ে অনার্স পাসের কৃতিত্ব অর্জন করেন। এরপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিষয়ে এম.এ. পড়তে চাইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিষয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রামী মুসলমান ছাত্রকে সংস্কৃত পড়াতে অস্বীকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন ১৯১২ সালে। এবং সে-বছর থেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভাষাতত্ত্ব বিভাগ খোলা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষার্থী ও শিক্ষক ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও লেখক হুমায়ুন কবীর (১৯০৬—১৯৬৯)। বিরল এই ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনায় দু-চার কথা থাকলে ভালো হত। বিশেষ করে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও বর্ণময় কর্মজীবন নিয়ে আজকালকার ছাত্র-ছাত্রীরা সেরকম কিছুই জানে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি মুসলমান উপাচার্য স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী (১৮৮৪—১৮৪৬) হলেন একজন রাজনীতিজ্ঞ ও খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ। উপাচার্য হিসেবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ হল ৮ অগাস্ট ১৯৩০ থেকে ৭ অগাস্ট ১৯৩৪ পর্যন্ত। পরবর্তীকালে ১৯৪৫ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

স্যার মুহাম্মদ আজিজুল হক (১৮৯২—১৯৪৭) ছিলেন একজন বাঙালি আইনজীবী, লেখক ও সরকারি কর্মকর্তা। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ইউনিভার্সিটি ল কলেজে লেখাপড়া করেছেন। গ্রামীণ কৃষকদের উন্নয়নের জন্য তিনি কাজ করতে গিয়ে উপমহাদেশের বহু বিশিষ্টজনের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ লাভ করেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবুল কাশেম ফজলুল হক, আবদুল্লাহ আল-মামুন সোহরাওয়ার্দী, নবাব সলিমুল্লাহ ও মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ। ১৯৩৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন এবং ১৯৪০ সালে পুনরায় এই পদে নিযুক্ত হয়ে একটানা চার বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববদ্যালয়ে তিনি নতুন ইসলামিক স্টাডিজ কারিকুলাম এবং ইসলামিক হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার নামের নতুন বিভাগ চালু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম 'দ্য ম্যান বিহাইন্ড দ্য প্লাউ', যেটি বহুদিন দুষ্প্রাপ্য থাকার পর সম্প্রতি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃপ্রকাশ করেছে।

এটা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় যে, স্বাধীনতার আগের এই দু-জন বাঙালি মুসলমানকে বাদ দিলে আমাদের রাজ্যে আজ তক কোনো সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাঙালি মুসলমান হননি। ব্যতিক্রম আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, যেটি ১৭৮০ সালে স্থাপিত পূর্ব ভারতের প্রাচীনতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আলিয়া মাদ্রাসার নবগঠিত রূপ।

সেকেন্দার আলি খান, ডোমপুকুর, নদিয়া।

সহৃদয় এক প্রাবন্ধিকের সাক্ষাৎকার

সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যায় 'আমার দিদিমার শিক্ষার গুণে আমি কমিউনাল হইনি' শিরোনামে অশোক পালের নেওয়া আজহারউদ্দিন খানের সাক্ষাৎকারটি পড়ে মুগ্ধ হলাম। সাক্ষাৎকারটি প্রয়োজন ছিল বাংলা সাহিত্যের। তিনি একজন গবেষক। একদা মুসলমানসমাজের যাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু প্রচারিত হননি বা প্রচারিত হতে পারেননি এক শ্রেণি সাহিত্যিকদের দ্বারা, সেইসব সাহিত্যিকদের তিনি আলোকিত করেছেন তাঁর গ্রন্থে।

ব্যক্তিগত কারণে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। ওঁর বাড়িতে কিছুকাল যাবৎ যাতায়াত ছিল। ওঁর মার্জিত ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। ওঁর পুরোনো এবং খুবই বড়ো লাইব্রেরি আমাকে সবচেয়ে অবাক এবং ভাবিয়ে দিয়েছে। চেয়ে থাকার মতো সেই লাইব্রেরি।

একবার এক পত্রিকা দপ্তর থেকে ২১ ফেব্রুয়ারির লেখা আনার জন্য আমি গিয়েছিলাম। এবং ওঁর সেই অমূল্য লেখাটি আমি আনি। নিবন্ধটি ছিল 'এপার বাংলার শিক্ষার হালহকিকত' শীর্ষক। পত্রিকার সম্পাদক ভদ্রতা বা অভদ্রতার কারণে লেখাটি ছাপতে পারেননি। আমি মনে কষ্ট পাই। নাই-বা ছাপলেন। তিনি 'আমার মাতৃভাষা' অনুষ্ঠানে সভাপতি হয়ে এলেন, পত্রিকাটি দেখলেন। আমি ওঁর দিকে চেয়ে আছি। এবং মাথা নামিয়ে নিলাম চেয়ারের নীচে। সভাপতির ভাষণে উনি যে-নিবন্ধটি দিয়েছিলেন, তার সবটি বললেন না দেখে। আমি অবাক হয়ে যাই। আগুন তো আগুনকে পোড়ায়। এই অগাধ বয়সে তিনি স্মৃতিকে ধরে রেখেছেন। তিনি বাংলাভাষাকে ভালোবাসেন। তিনি প্রায়ই বলেন, বাংলাদেশ যা পেরেছে, এপার বাংলা পারবে না কেন বাংলাকে নিয়ে ভাবতে?

'আল-আমীন বার্তা'কে ধন্যবাদ এমন প্রাবন্ধিকের সাক্ষাৎকার ছাপার জন্য।

টোকন মান্না, খড়িকা, সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেমন হবে? নিজের প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় বিদ্যালয়'-এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, (এই বিদ্যালয়ে) "আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব— ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা চলন্ত পুঁথি হইব, অধ্যাপকের সজীব নোটবুক হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইব, ইহা গর্বের বিষয় নহে। আমরা জগতের ইতিহাসকে নিজের স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করিলাম কই, আমরা পোলিটিকাল ইকোনমিকে নিজের স্বাধীন গবেষণার দ্বারা যাচাই করিলাম কোথায়। আমরা কী, আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে-ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন সে-ক্ষেত্র হইতে মহাসত্যের কোন্ মূর্তি কী ভাবে দেখা যায়, শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আমরা আবিষ্কার করিলাম কই। আমরা কেবল:

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই।
হায়, শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব।"

কবি শিক্ষার নাগপাশের কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। চেয়েছিলেন শিক্ষার মুক্তি। ভয়ে ভয়ে শুধু পুথি আওড়ানোই প্রকৃত শিক্ষা নয়। স্বাধীনভাবে যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করবার শক্তি, লিখবার শক্তি, বলবার শক্তিই বিদ্যা আহরণের মূল উদ্দেশ্য। এমনই উদ্দেশ্যে একদিন আল-আমীন মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সে-লক্ষ্যে আজও আমরা অবিচল।

এরকমই মুক্তচিন্তার মানুষ ছিলেন অধুনাবিস্মৃত মনীষী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। সেই মনীষীকে আমরা আজ ভুলে যেতে বসেছি। অথচ, কী ছাত্রজীবনে, কী শিক্ষকজীবনে, কী প্রশাসনিক অতি উচ্চপদে এতটাই সফল যে, তাঁর সমসময়ে তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। সেই বিস্মৃতপ্রায় মানুষটি বিষয়ে একটি লেখা থাকছে এই সংখ্যায়। আর কিছু নয়, হুমায়ুন কবীরের মতো বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষকে ফিরে দেখার এটি ছোট্টো এক প্রয়াস।

অকালপ্রয়াণ ঘটল প্রিয় সাহিত্যিক সোহারাব হোসেনের। তীক্ষ্ণ মেধার সোহারাব হোসেন মাত্র ৫২ বছর বয়সে চলে গেলেন তাঁর বহু অসম্পূর্ণ কাজ ফেলে রেখে। বাংলাভাষার যে-কয়েক জন গদ্যলেখক সাম্প্রতিক সময় আর মানুষজনের ঘূর্ণ্যাবর্তকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছেন, সোহারাব হোসেন তাঁদের অগ্রবর্তীজন। এমন প্রতিভাসম্পন্ন লেখককে স্মরণ করা প্রতিটি বাঙালি পাঠকের অবশ্যকর্তব্য। আমরা সেই কাজটিই করছি এই সংখ্যায় দুটি লেখা প্রকাশ করে।

আল-আমীন মিশনের সমস্ত শুভানুধ্যায়ীকে আর 'আল-আমীন বার্তা'র সমস্ত পাঠক এবং লেখককে আমাদের প্রীতি, শুভেচ্ছা আর কৃতজ্ঞতা জানাই।

কৃতবিদ্য মানুষেরা অনেক ওঠা-পড়া আর ভাঙা-গড়ার ভেতর দিয়ে একদিন নিজের কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করেন মহৎ অভিপ্রায়ের মূল্য কত গভীর। আর সেই অভিপ্রায় না থাকলে কোনো দিক থেকেই দরজা খোলা যায় না। দরজা খোলার কাজটি যাঁরা পেরেছেন, তাঁদের নিয়ে এই বিভাগ।

বিস্মিত বিস্মরণ হুমায়ুন কবীর

কাজি তাজউদ্দিন

ভারতবর্ষের এক উত্তাল সময়পর্বে বাংলার মাটিতে বাঙালির এক প্রাণপুরুষের আগমন ঘটে। যিনি ছিলেন অসাধারণ এক প্রতিভার অধিকারী। খাঁটি বাঙালি সেই কৃতী মানুষটি তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি রেখেছেন সমাজ ও দেশের নানা আঙিনায়। মেধাবী ছাত্র, দক্ষ শিক্ষক, সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক, সংস্কৃতিমনস্ক ও একজন সফল রাজনীতিবিদ হিসেবে নিজ পরিচয় রেখেছেন। ১৯০৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলাশহরের অন্তর্গত কোমরপুরে জন্ম হুমায়ুন কবীরের। পুরো নাম হুমায়ুন জহিরুদ্দিন আমির-ই-কবীর। পিতার নাম খান বাহাদুর আব্দুল খয়ের কবীরউদ্দিন আহমদ, পেশা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মাতা সাজেদা খাতুন। হুমায়ুন ছিলেন পিতা-মাতার দ্বিতীয় পুত্র, চতুর্থ সন্তান।

শিক্ষাজীবন

হুমায়ুন কবীরের শিক্ষাজীবন শুরু হয় ঢাকার সেন্ট গ্রেগারিজ স্কুলে— ছয় বৎসর বয়সে। পিতার বদলির চাকরিসূত্রে কুমিল্লা জেলা স্কুল, কৃষ্ণনগর জেলা স্কুল ঘুরে নওগাঁর কালীধন হাই স্কুল বা কে ডি হাই স্কুল প্রভৃতি শিক্ষায়তনে তাঁর পড়াশোনা। এই কে ডি হাই স্কুলের বার্ষিক ম্যাগাজিন সম্পাদনার দায়িত্ব পান হুমায়ুন কবীর। এখান থেকেই ১৯২২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেন (রাজশাহি বিভাগে তাঁর স্থান ছিল প্রথম)। ওই বছরই কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণিতে ভর্তি হন। কলেজজীবনের স্মৃতিচারণে হুমায়ুনের একজন সহপাঠী বলেন, "বেশ মনে আছে, কলেজে প্রকাণ্ড সিঁড়ির পিছনে টাঙানো রুটিন টুকে আনতে গিয়ে সবাই লক্ষ না করে পারল না বেঁটেখাটো আচকান-পরা আর উচ্ছল এবং ব্যগ্র একটি ছেলেকে, যে পরবর্তী জীবনে সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান হয়েছিল।" অচিরেই ফিজিক্স থিয়েটারে (যেখানে কলেজের বড়ো বড়ো মিটিংগুলো হত) তিনি হয়ে উঠলেন অন্যতম বক্তা। ১৯২৬ সালে পেলেন কলেজ ম্যাগাজিনের দায়িত্ব। ড্রামাটিক সোসাইটির সভাপতি হলেন ১৯২৭ সালে। ১৯২৮ সালে সভাপতি হন ছাত্রাবাসের (৬২ মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের বিখ্যাত ওয়াই এম সি এ হস্টেল), যেখানে হিন্দু-ব্রাহ্ম-খ্রিস্টান ছাত্ররাও থাকত। অন্নদাশঙ্কর রায় মনে করেন হুমায়ুনের 'ধর্ম নিরপেক্ষতার সেটাও একটা সেতু'। প্রেসিডেন্সির শিক্ষক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, সে-সম্পর্ক পারিবারিক পর্যায়ে পৌঁছোয়। তাঁর এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূলে ছিল তাঁর পিতা এবং পারিবারিক প্রভাব। কোনো ঘটনাতেই

বিচলিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি স্থান দেননি নিজ জীবনে। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান বিবেচনা করেননি। তাই অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন, "কমিউনাল হতে চাইলে হুমায়ুন কবীরকে ঠেকাত কে? অবিভক্ত বঙ্গের মন্ত্রী তো হতেনই, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপদেও পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্ব করতেন।"

১৯২৪ সালের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র মেধা-তালিকায় তৃতীয় স্থান অর্জন করলেন। ইংরেজিতে পেলেন সর্বোচ্চ নম্বর। ডাফ প্রাইজ ও সরকারি বৃত্তি লাভ করলেন। অনার্স নিলেন ইংরেজিতে। ১৯২৬ সালে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এই প্রথম কোনো মুসলমান ছাত্র এমন কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। এবারে পেলেন চারটি পুরস্কারের মধ্যে অনার্সে প্রথম হওয়ার জন্য সর্বেশ্বর পূর্ণচন্দ্র স্বর্ণপদক ও বৃত্তি এবং ১৯২৭ সালে মঞ্জুর হল স্টেট স্কলারশিপ— বিদেশে পড়বার সুযোগ। তবে তার আগে শেষ করতে হবে এম.এ.। এম.এ.-তেও তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হলেন (প্রথম বাঙালি মুসলমান)। আরেকটি কারণে বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষার ইতিহাসে ওই বছরটি স্মরণীয়। 'দেশ' পত্রিকায় পরবর্তীকালে লেখা হল: "১৯২৮ সালের এম.এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। বাঙালি মুসলমান সমাজে খুশির উন্মাদনা। দু-জন মুসলমান ছাত্র দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন। সেই সেই বিষয়ে ইতিপূর্বে কোনো মুসলমান ছাত্র এই কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। হুমায়ুন কবীর ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং মুহাম্মদ মনসুর-উদ্-দীন বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয়। দু-জনেই পরবর্তী জীবনে হয়েছিলেন কৃতীপুরুষ।" এবারে হুমায়ুন পেলেন রেজিনা গুহ স্বর্ণপদক, বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক, বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার ইত্যাদি।

ইংরেজিতে পেলেন সর্বোচ্চ নম্বর। ডাফ প্রাইজ ও সরকারি বৃত্তি লাভ করলেন। অনার্স নিলেন ইংরেজিতে। ১৯২৬ সালে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এই প্রথম কোনো মুসলমান ছাত্র এমন কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন।

যখন অক্সফোর্ডে।

এরপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য পূর্ব-ঘোষিত বৃত্তির আনুকূল্যে গমন করলেন ইংল্যান্ড, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষানিকেতন অক্সফোর্ডে। সেখানেও অর্জন করলেন শ্রেষ্ঠতম সাফল্য। অক্সফোর্ড থেকেই প্রকাশ করলেন 'Bharat' নামে পত্রিকা। ১৯৩০ সালে প্রথম বারের মতো একজন এশীয় অক্সফোর্ড ইউনিয়ন সোসাইটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হলেন তিনি। পরের বৎসর সভাপতি পদে দাঁড়িয়েছিলেন, পরাজিত হয়েছিলেন মাত্র তিন ভোটের ব্যবধানে। সভাপতি ছিলেন অক্সফোর্ড ইন্ডিয়ান মজলিশের (১৯৩০)। কার্যনির্বাহী সদস্য ছিলেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টসের (১৯৩০)। নিজ কলেজের (একসেটর কলেজ) ডায়ালেকটিক্যাল সোসাইটির সভাপতি হন (১৯৩০)। ১৯৩১ সালে সভাপতি নির্বাচিত হলেন জোয়েট সোসাইটির। অক্সফোর্ড ইউনিয়ন সোসাইটির লাইব্রেরিয়ানের সম্মানজনক পদটিও অলংকৃত করেছিলেন তিনি। এই সময় ব্রিটেনের বিখ্যাত সব পত্রিকায় তাঁর লেখাও প্রকাশিত হত। একজন বাঙালি তথা ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে এসব কিছু শুধু অভূতপূর্ব নয়, অভাবনীয় ঘটনাও বটে। তাঁর ডিগ্রির নাম ছিল মডার্ন গ্রেটস— বিষয় ছিল দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি। ১৯৩১ সালে ফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল এই প্রথম একজন এশীয় ছাত্র উক্ত বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান দখল করলেন। কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের কথায়, "এই ঘটনা হুমায়ুনের কর্মমুখর জীবনে খুবই নগণ্য ব্যাপার। কিন্তু তদানীন্তন দাসজাতির পক্ষে তা আদৌ অকিঞ্চিৎকর ছিল না। বর্তমান স্বাধীন আবহাওয়ায় সেই প্রক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম করা আজ রীতিমতো কঠিন।" হুমায়ুন কবীরের এই তুলনারহিত শিক্ষাজীবন যেকোনো উচ্চাভিলাষী ছাত্রের কাম্য হতে পারে।

ইতিহাস কংগ্রেসের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে।

কর্মজীবন

বিস্ময়কর একটি শিক্ষাজীবন শেষ করে কবীর ১৯৩২ সালে যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁর জন্য এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সেটা হল, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের (বর্তমান মৌলানা আজাদ গভ. কলেজ) সিনিয়র সার্ভিসে ইংরেজির অধ্যাপক পদে তাঁকে নেওয়া হল না। অযোগ্যতা হিসেবে বলা হল, প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি অনার্স সম্পন্ন করলেও অক্সফোর্ডে তাঁর বিষয় ইংরেজি ছিল না। কথাশিল্পী আবু রুশদ এ-প্রসঙ্গে বলেন, "সর্বোপরি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার চাপে সেই পদের জন্যে হুমায়ুন কবীরকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। তখন থেকেই তাঁর

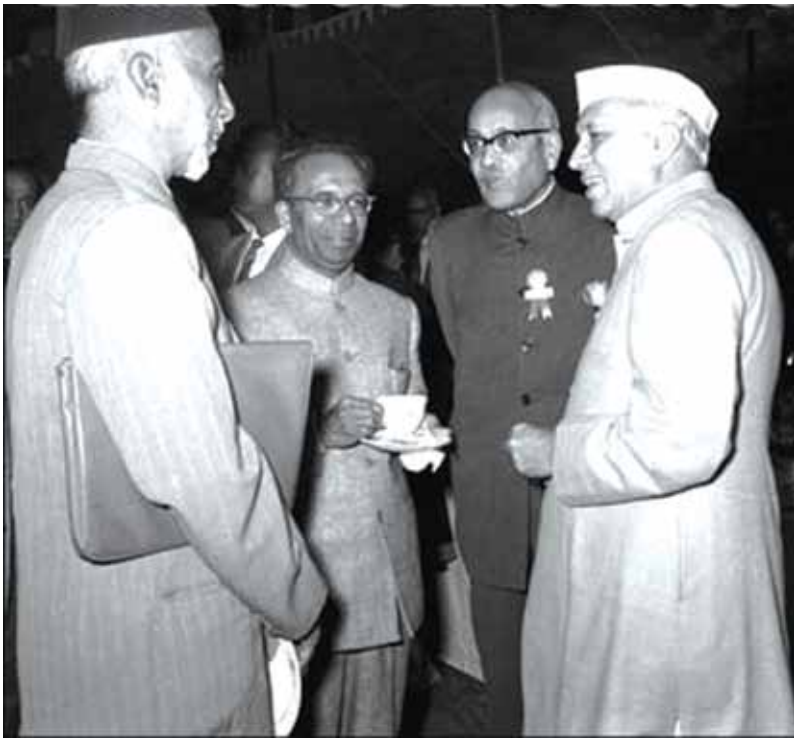

এশীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে বিদেশী ইতিহাসবিদদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবীর।

সরকার-বিরোধী ভাব প্রকট হয়ে ওঠে। এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন।" হুমায়ুন বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে যদি জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে যুক্ত করা যায় তাহলেই জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে। পরবর্তীকালে এক ছাত্র সম্মেলনে (বর্ধমান ছাত্র সম্মেলন, আশ্বিন ১৩৪৩) তিনি বলেছিলেন, "আমরা সমাজে বাস করি। রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার প্রভাব সমাজের প্রতি ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়। তাই সামাজিক জীবনে রাজনৈতিক প্রভাব এড়িয়ে চলা যায় না। ... সমাজে বাস করতে হলে রাজনীতি নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া তাই অনিবার্য এবং শিক্ষার দিক থেকেও ছাত্রেরা রাজনীতিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে পারে না।"

১৯৩২ সালেই কবীর অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের প্রভাষকরূপে যোগ দেন। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ভাইস-চান্সেলর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন (১৯৮৮—১৯৭৫)। পরের বছর রাধাকৃষ্ণন চলে আসেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম কিং জর্জ প্রফেসর অফ মোরাল ফিলোজফি হিসেবে, তখন হুমায়ুন কবীরকেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য নিয়ে আসেন। কবীর যে পরবর্তীকালে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন, তার উৎস-প্রভাব হিসেবে রাধাকৃষ্ণনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দু-জনের চিন্তা-চেতনার সাযুজ্যে নৈকট্য না থাকলেও তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ঐক্য— এই দুই মনীষীই অখণ্ড ভারতীয়তে বিশ্বাসী ছিলেন।

যে কলকাতার একটি কলেজে হুমায়ুন প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, সে কলকাতারই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যোগ দিলেন। প্রথমে দর্শন বিভাগ হলেও পরবর্তী বৎসর (১৯৩৪) ইংরেজি বিভাগেরও লেকচারার হলেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রভাষক ছিলেন ওই ইংরেজিতেই। ১৯৪২ থেকে তিনি বিভিন্ন সময়ে মাদ্রাজ, মহীশূর, কলকাতা এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শন বিভাগের পিএইচ.ডি., ডি.ফিল. এবং ডি.লিট. গবেষণার পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর শিক্ষকতা প্রসঙ্গে শাহরিয়ার ইকবাল লিখেছেন, "কোনো প্রকার প্রস্তুতি ছাড়াই লেকচার দিতেন, এমন একজন বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে বি.এ. (অনার্স) ও এম.এ. ক্লাসের ছাত্রদের উদ্দেশে পঞ্চাশ মিনিট বক্তৃতা দেয়াটা দুরূহ ব্যাপার ছিল না।" শিক্ষক হুমায়ুন কবীর ১৯৪৬-এ 'Our heritage' ('The Indian Heritage') গ্রন্থ প্রকাশ করেন। স্বাধীনতার পর মৌলানা আজাদ শিক্ষামন্ত্রী হলে কবীরকে তাঁর মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব করে দিল্লিতে নিয়ে আসেন। ১৯৫০-এ স্বাধীন ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ সচিব। মৌলানা আজাদের আত্মজীবনীমূলক রচনা 'India Wins freedom' কবীরেরই অনুলিখন এবং অনুরোধেই রচিত। শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব হুমায়ুন কবীর তর্কাতীত যোগ্যতার সাথেই পালন করতে থাকেন। এবং ১৯৫৫ সালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর পরামর্শে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। নব্য স্বাধীন ভারত গঠনে হুমায়ুনের কাছে নেহরু ছিলেন গুরুতুল্য।

কংগ্রেসে যোগদানের পর ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মনোনয়ন পেয়ে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। এবং নেহরু তাঁকে সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বের পদ অক্ষুণ্ণ রাখতে ১৯৫৭ সালে উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট কেন্দ্রে লোকসভার নির্বাচনে দাঁড়ান এবং জয়ী হন। ১৯৫৮-তে তাঁকে সাইন্টিফিক রিসার্চ অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রণালয় দেওয়া হয়। ১৯৬৩ সালে পান পেট্রোলিয়ম ও কেমিক্যালস মন্ত্রণালয়। কংগ্রেস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি শেষোক্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

১৯৬৪ সালে জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর প্রথমে লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং পরে নেহরুকন্যা ইন্দিরা গান্ধী (১৯৭১—১৯৮৪) প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৬৭-তে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মন্ত্রীসভা রদবদল করেন এবং বাদ দেন কবীরকে। অবশ্য তাঁকে মাদ্রাজের গভর্নর পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ক্রুদ্ধ হুমায়ুন পশ্চিমবঙ্গে অজয় মুখার্জির বাংলা কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁরই সাহায্যে স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হল বাংলায়। 'যুক্তফ্রন্ট' নামটিও কবীরেরই দেওয়া। কবীরের মন্তব্য, "আজ বাংলাদেশে যা করে দিয়ে গেলাম ভবিষ্যতে ভারতেও তাই হবে। এই শুরু

১৯৩০ সালে প্রথম বারের মতো একজন এশীয় অক্সফোর্ড ইউনিয়ন সোসাইটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হলেন তিনি। তাঁর ডিগ্রির নাম ছিল মডার্ন গ্রেটস— বিষয় ছিল দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি। ১৯৩১ সালে ফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল এই প্রথম একজন এশীয় ছাত্র উক্ত বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান দখল করলেন।

হল যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির যুগ। সমগ্র ভারত এই রাজনীতিকে অনুসরণ করবে।" পরবর্তীকালে কবীর নিজে লোকদল নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে বিধানসভা ভোটে লড়লেন, কিন্তু সাফল্য পেলেন না।

বিবাহ ও পারিবারিক জীবন

এম.এ. ক্লাসের সহপাঠী ব্রাহ্ম হৃদয়চন্দ্রের কন্যা শান্তি দাসের সঙ্গে কবীর সিভিল ম্যারেজ করেন ২ অক্টোবর ১৯৩২ সালে। এই বিয়ে সম্পর্কে কবীরের ভাগ্নে আবু রুশদ লিখেছেন, "তাঁর আত্মীয় মহল সেই বিবাহে শুধু সাড়া দেয়নি, তা নয়, অনেকটা শীতল উপেক্ষাও দেখিয়েছিলেন।" অবশ্য খুব শীঘ্রই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে আসে। একমাত্র পুত্র প্রবাহণ কামাল পাশার জন্ম ১৯৩৩ সালে। পাশা ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। বিয়েও করেছেন আমেরিকার মেয়ে ফ্লোরেন্সকে। একমাত্র কন্যা লায়লার জন্ম ১৯৩৬ সালে। অক্সফোর্ডের পড়ুয়া লায়লা বিয়ে করেছেন ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজকে।

সাহিত্যচর্চা, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা

জীবনের প্রতিটি পদচারণায় হুমায়ুন কবীর সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য। পিতার লাইব্রেরি থেকে যে কবির জন্ম, স্কুলজীবনে তার রূপ পেতে থাকে। কবিতা-গল্প রচনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রজীবনেই পত্রিকা সম্পাদনার অভিজ্ঞতাও অর্জন করেন তিনি। কলেজজীবনে তিনি একাধিক পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব সামলেছেন। কলেজে পড়াকালীনই প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্নসাধ' (১৯২৭)। কবিতা, গল্প ছাড়াও তিনি সে-সময়ে সকল বিখ্যাত পত্রিকাতে প্রবন্ধও লিখেছেন। শোনা যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের নাট্য সমিতির সভাপতি থাকাকালীন তিনি কিছু নাটকও লেখেন। অক্সফোর্ডে থাকাকালীন 'Sis' ও 'Cherwell' নামক দুটি পত্রিকা এবং অক্সফোর্ড থেকে দেশে ফিরে ১৯৩২ সালে 'বারমাসি' নামে একটা ষান্মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তবে বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর সম্পাদিত অতি উচ্চমানের 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার জন্য। পত্রিকাটি সম্পর্কে সৈয়দ মর্তুজা আলী বলেন, "বাংলা সাময়িক সাহিত্যে এরকম উন্নতমানের পত্রিকা অল্পই প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকার স্থান সবুজ পত্রের পরেই নির্দিষ্ট করা যায়।"

কবীর ১৯৪৪ সাল থেকে একটি ইংরেজি সাহিত্য পত্রিকাও বের করেন— 'India' নামে। এ ছাড়াও তিনি একাধিক পত্রিকার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথমত কবি হিসেবেই হুমায়ুন কবীরের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন 'স্বপ্নসাধ' (১৯২৮) 'সাথী' (১৯৩০) ও 'অষ্টাদশী' (১৯৩৮)। কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকৃতি ও প্রেম বিষয়ক, সঙ্গে রোম্যান্টিক মানসের পরিচয় বহন করে। ১৯৪৩ সালে উর্দু থেকে 'মসদ্দসে হালী'র বাংলা অনুবাদ তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব।

খুব সংক্ষিপ্ত হলেও হুমায়ুন কবীর কথাসাহিত্যের জগতেও নিজেকে বিস্তৃত করেছেন। তিরিশের দশকে তাঁর লেখা কয়েকটি ছোটোগল্প স্বনামে ও বেনামে প্রকাশিত। ১৯৪৫ সালে তাঁর 'নদী ও নারী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় এবং একই বছর 'Men and Rivers' নামে এর একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে কবীর নদীকেন্দ্রিক পরিবেশে মুসলমান সমাজজীবনের একটি নিখুঁত চিত্র উপস্থাপন করেছেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকায় উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবীর।

হুমায়ুন কবীরের অন্য আরেক পরিচয় একজন প্রবন্ধকাররূপেও। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় তিনি দর্শন, সাহিত্য, শিক্ষানীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল— 'ইমানুয়েল কান্ট' (১৯৩৬) 'শরৎ সাহিত্যের মূল তত্ত্ব' (১৯৪২), 'ধারাবাহিক' (১৯৪৩), 'বাংলার কাব্য' (১৯৪৫), 'মার্কসবাদ' (১৯৫১), 'নয়া ভারতের শিক্ষা' (১৯৫৫), 'শিক্ষক ও শিক্ষার্থী' (১৯৫৭), 'মিরজা আবু তালিব খান' (১৯৬১) 'দিল্লী-ওয়াশিংটন-মস্কো' (১৯৬৪) প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার জন্য একাধিক ইংরেজি গ্রন্থও রচনা এবং অনুবাদ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ— 'Rabindra Nath Tagore' (1945), 'Sarat Chandra Chatterjee' (1942), 'Studies in Bengali Poetry' (1964), 'The Bengali Novel' (1968) ইত্যাদি গ্রন্থের সঙ্গে বাংলা ছোটোগল্পের ইংরেজি অনুবাদ ও সংকলন 'Green and Gold' (1957)-এর কথাও বলা যায়। এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত তাঁর ইংরেজি গ্রন্থগুলি হল: 'Kant on philosophy in General' (1935), 'Poetry, Monads and Society' (1941), 'Muslim Politics in Bengal' (1943), 'Science Democracy and Islam' (1955), 'Education for Tomorrow' (1968), 'Mi-

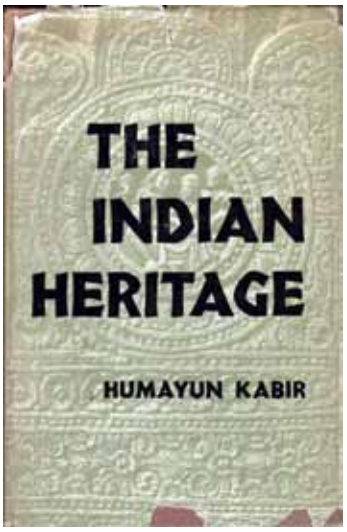

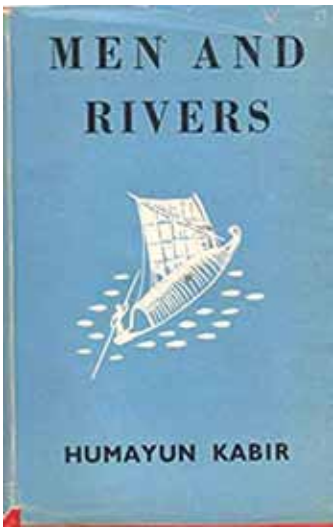

norities in Democracy' (1969) ইত্যাদি। সব মিলিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশটি।

হুমায়ুন কবীরের মানবিক গুণগুলির মধ্যে একটি হল— রাষ্ট্রীয় গুরুপদগুলোতে থাকাকালীন তিনি বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সেবা করে গেছেন। বাঙালি সাহিত্যিকের কারো কারো সময়ে-অসময়ে জীবিকার বিষয়টি দেখাও যেন নিজ কর্তব্য জ্ঞান করতেন। প্রসঙ্গাসূত্রে কবি বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য স্মরণযোগ্য, "সারা দিল্লী কলকাতার সরকারি মহলে বাঙালী সাহিত্যিকের দরদী বন্ধু যে তাঁর মত আর কেউ ছিলেন না, এ কথাও আমি প্রত্যক্ষভাবে জেনেছিলাম। অন্যদের উদাহরণ থেকেও, আমার নিজের জীবনেও।"

সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী থাকা কালে বাঙালি সাহিত্যিকরা পর পর কয়েক বার সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। এজন্য তাঁকে বাঙালির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অপবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি বলতেন যে, বাঙালি সাহিত্যিক তাঁর প্রাপ্য হতে এতকাল বঞ্চিত হয়েছেন, তা তিনি মন্ত্রী থাকা কালে হতে দেননি। সাহিত্য অকাদেমি-সহ সংগীত অকাদেমি ও ললিতকলা অকাদেমি তাঁরই পরিকল্পনা। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে রবীন্দ্রসদন প্রতিষ্ঠা তাঁরই প্রচেষ্টার ফল। রামকৃষ্ণ ইনসটিটিউট, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম তাঁর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত। এশিয়াটিক সোসাইটির নতুন ভবনও তাঁরই অবদান। এইভাবে নানা সময়ে নানাভাবে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করেছেন উদার মনে।

সম্মাননা ও স্বীকৃতি

বহুগুণান্বিত হুমায়ুন কবীর তাঁর জীবৎকালে নিজ যোগ্যতার স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করেছেন একাধিক বার দেশে ও বিদেশে। ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট. ডিগ্রি দিয়েছিল। অক্সফোর্ডে এক্সলেটর কলেজ তাঁদের প্রাক্তন ছাত্র হুমায়ুনকে অনারারি ফেলো মনোনিত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন ১৯০৭ সালে। তিনি হচ্ছেন প্রথম এশীয়, যিনি অক্সফোর্ডে হার্বার্ট স্পেনসার বক্তৃতা দেন ১৯৬৭ সালে, যেখানে তাঁর পূর্বে আইনস্টাইন, বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো মনীষীগণ বক্তব্য রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই একমাত্র ভারতীয় হিসেবে গ্রিসের PINKA মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দিয়েছেন। লন্ডন ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একাধিক বার বক্তৃতা দিয়েছেন। তেমনি বক্তৃতা দিয়েছেন আমেরিকার একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ ছাড়া শ্রীলঙ্কার শ্রীপালী ইনসটিটিউটে (১৯৫৯), সিরিয়ার দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৬১), বুলগেরিয়ার সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৬১) এবং ডেনমার্কের ইন্টারন্যাশনাল কলেজ অফ ইলিনোরে (১৯৬৭) বক্তৃতা দেন। তা ছাড়াও ভারতীয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষানিকেতন তো ছিলই।

আমেরিকা সরকার তাদের দেশের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য একাধিক বার হুমায়ুন কবীরকে পরামর্শক হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ১৯৬০ সালে আমেরিকার চতুর্থ শিক্ষা সম্মেলন তিনিই উদ্‌বোধন করেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এর পূর্বের সম্মেলনটির উদ্‌বোধক ছিলেন স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট ডিড় আইজেনহাওয়ার। ১৯৬০ সালে তাঁর আরও দুটি সম্মানসূচক কাজ হল প্যারিসে সিটি ইউনিভার্সিটিতে ইন্ডিয়া হাউসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং যুগোশ্লাভিয়ার জাগরেব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্টাডিজের উদ্‌বোধন। তিনি ইউনেস্কোর বিভিন্ন সম্মেলনে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ১৯৬১-তে এশীয় ইতিহাস সম্মেলনের সভাপতি হন। ১৯৬৪ সালে সভাপতি হয়েছিলেন ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ওরিয়েন্টালিস্টের। ১৯৬৪-'৬৫ সালে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতি হন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে পেয়েছেন একাধিক সম্মান। হুমায়ুন কবীর সম্পর্কে সাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত হল যে, "রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর মাত্র তিনজন ভারতীয় পরে বিশ্বের দরবারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাঁরা হলেন রাধাকৃষ্ণন, জওহরলাল নেহরু ও হুমায়ুন কবীর।" রচনাকার হিসেবেও তিনি যে সফলতা পেয়েছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৫৬ সালে অল ইন্ডিয়া রাইটার্স কনভেনশনের এবং ওই বৎসরই দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশীয় লেখক সম্মেলন তিনিই উদ্‌বোধন করেন।

মৃত্যু

১৯৬৯ সালের ১৮ অগাস্ট হুমায়ুন কবীর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে দিল্লির ওয়েলিংটন হাসপাতালে ভর্তি হন। এবং ওই দিনই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মরদেহ দিল্লির জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কবরস্থ করা হয়। বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী, কৃতী পুরুষ হুমায়ুন মাত্র ৬৬ বছর বয়সে অকালমৃত্যু বরণ করলে বাঙালি তথা ভারতবর্ষ এক গুণী মানুষকে হারায়। হুমায়ুন কবীরের মূল্যায়ন করতে গিয়ে মনে পড়ে সাহিত্যিক আবুল ফজলের একটি মন্তব্য, "আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে যে সীমিত সংখ্যক মনীষা মুসলমান সমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, নিঃসন্দেহে হুমায়ুন কবীর তাঁদের অন্যতম। তাঁর তিরোধানে ভারতীয় মুসলমান সমাজ বহু দিক দিয়েই দরিদ্র আর ভারতীয় রাজনীতি একটা সুস্থ ও স্বচ্ছমনের অবদান থেকে হল বঞ্চিত ... তার চেয়েও দুঃখের বিষয় মননশীলতার আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়ল। ভারতের রাজনীতি হারাল একজন বিজ্ঞ চিন্তানায়ককে আর ভারতের মুসলমানরা হারাল একজন সুযোগ্য প্রতিনিধিকে, যিনি তাদের হয়েও নিজের যোগ্যতা আর গুণপনায় হতে পেরেছিলেন সর্বভারতের, এমন মানুষ সব সমাজেই দুর্লভ।" ■

হুমায়ুন কবীর সম্পর্কে সাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত হল যে, "রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর মাত্র তিনজন ভারতীয় পরে বিশ্বের দরবারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাঁরা হলেন রাধাকৃষ্ণন, জওহরলাল নেহরু ও হুমায়ুন কবীর।"

আমাদের ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে গেলেন তিনি। সার্থক ঔপন্যাসিক সোহারাব হোসেন। তিনি তাঁর সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রে রেখেছেন মানুষকে। এ-মানুষ মূলত নিম্নবর্গীয়। তাঁদের শীর্ণ শরীর ও মন তাঁকে তাড়িত করেছে প্রতি নিয়ত। তাঁর প্রয়াণের পরে তাঁকে স্মরণ করার প্রতিটি সময়ে আমরা পীড়িত হয়েছি এই ভেবে যে, তিনি বড়ো অকালে চলে গেলেন।

লোকজীবনের কথাশিল্পী সোহারাব হোসেন

কথাশিল্পী যখন বাস্তবজীবনের জলেকাদায় রোদেঝড়ে গড়েপিটে তোলেন নিজেকে, তখন তিনি তাঁর নির্মিত কাহিনির আয়তনে অথবা আখ্যানহারা কথার ভেতরে তথ্য ও তত্ত্বের অতিরিক্ত এমন কিছু প্রতিষ্ঠা করেন, যা সাহিত্যের পরমধন। সোহারাব হোসেন তেমন একজন ঔপন্যাসিক। অধুনান্তিক সময়ের এই কথাকার জন্মসূত্রে দরিদ্র, সাহিত্যসাধনার সিদ্ধিতে সুধী মহাজন। তিনি লিখেছেন অনেক কিছু— কবিতা, নিবন্ধ, শিশু-কিশোরদের লেখা— তবু আমাদের কাছে তাঁর নির্জন স্বাক্ষর মুখ্যত উপন্যাসের জন্য। সাহিত্যের অপরাপর শাখার চাইতে এই সময়ের প্রকৃতি উপন্যাসেই সার্থকতমভাবে উদ্‌ঘাটিত হতে পারে আজ, এখনও এর সম্ভাবনা প্রবল। সোহারাবের উপন্যাস সেইসব সম্ভাবনার ইশারাকে অনুধাবন করে এগিয়েছে ক্রমাগত, ফলে সময়ও সেসবে অভিনব মাত্রায় ধরা দিয়েছে। কী নেই তাঁর উপন্যাসে— লোকজীবনের সংস্কৃতি, বাউলের দর্শন, পুরাণের

প্রতিমা, মুসলমান জনপদ, রাজনৈতিক বাস্তবতা ইত্যাদি আরও কত কিছু— আর এসব কিছুকে ছাপিয়ে আছে উপন্যাস লেখার শিল্প। অদক্ষিণপন্থী রাজনীতির প্রতি বিশ্বাস সোহারাবকে এমন এক ভাবনায় ভাবিয়েছে গোটা জীবন যে, তিনি তাঁর সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রে রেখেছেন মানুষকে। অক্ষের মতো মানুষের চারদিকে আবর্তিত হয়েছে বাকি সব কিছু। বলা বাহুল্য, এ-মানুষ মূলত নিম্নবর্গীয়। তাঁদের শতচ্ছিন্ন শরীর ও মন তাঁকে তাড়িত করেছে প্রতিনিয়ত, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুপুঙ্খ লক্ষ করেছেন তিনি। তাঁর কথা ও সাহিত্য ওই জীবনের আলো-অন্ধকারের সত্যকে আবিষ্কার করতে করতে ক্রমশ পরিণতির দিকে এগিয়েছে। মানুষের মৃত্যু হলেও মানব থেকে যাবে— এই প্রত্যয় থেকে ক্ষণিকের জন্যও সরে যায়নি তাঁর লিখনাবলী। তাঁর প্রয়াণের পরে তাঁকে স্মরণ করার প্রতিটি সময়ে আমরা পীড়িত হয়েছি এই ভেবে যে, তিনি বড়ো অকালে চলে গেলেন। বেঁচে থাকলে তাঁর আরও আরও মননের স্পর্শে আমরা আরও বেশি ধনী হতাম। এ-দুঃখ অবসানের নয়। এই বিভাগে তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে দুটি নিবন্ধ রয়েছে, লিখেছেন এই সময়ের এক কীর্তিমান বাঙালি ঔপন্যাসিক **নলিনী বেরা** এবং তরুণ গবেষক **গোলাম রাশিদ**।

শেকড়সন্ধানী সোহারাব

নলিনী বেরা

বাংলা সাহিত্যের চর্চা 'চর্যাপদ' থেকেই। তবে সব চর্যাকাররাই যে বাঙালি ছিলেন, এমনটাও নয়। ভুসুকু, শান্তিপাদ, কুক্কুরিপাদ, শবরীপাদ, তদুপরি বৌদ্ধ মহাচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যে বাঙালি ছিলেন, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কী! কিন্তু এসব তো অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ শতকের কথা। গৌড়ে তখন পাল ও সেন যুগ। "উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী। মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিন সবরী গুঞ্জরী মালী।" বাংলা ছাড়া এমন দৃশ্য আর কোথায়-বা পাওয়া যাবে, বাঙালি ছাড়া এমনতরো চিত্রকল্প কেই-বা রচনা করবে! প্রাক্-তুর্কীযুগের একটা পদ— "সো মহ কন্তা দূর দিগন্তা। পাউস আএ চেনু দুলাএ।।" আমার স্বামী গিয়েছে দূর-দিগন্তে। প্রচুর বৃষ্টি আসছে, চিত্ত ভারি চঞ্চল হচ্ছে। কে বলে "শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?" তা ছাড়া লক্ষণসেনের সখা বটু দাসের পুত্র শ্রীধর দাসের সেই বিখ্যাত কাব্যসংকলন 'সুদুক্তিকর্ণামৃত'-এর কথা, "ব্রীহিঃ স্তম্ভকারিঃ প্রভূত পয়সঃ প্রত্যাগতা ধেনবঃ", প্রচুর জল পেয়ে ধান গাছগুলি চমৎকার গজিয়ে উঠেছে, গোরুগুলি ঘরে ফিরছে, আম গাছগুলিও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে, আর কোনো ভাবনা নেই, ঘর্মক্লান্তিমুক্ত স্ত্রীও ইত্যবসরে উশীর প্রসাধন করছে, বাইরে আকাশ থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, যুবকটি সুখে শুয়ে রয়েছে—

প্রাক্-তুর্কীযুগে 'নাথ-ধর্ম'কে ঘিরেও এক ধরনের সাহিত্যচর্চা ছিল চর্যাগীতের ন্যায় গূঢ় সাধনতত্ত্ব হেঁয়ালি

করেই লেখা হত। রাজা মানিকচন্দ্র, রানি ময়নামতী আর রাজপুত্র গোপীচাঁদের কাহিনি। পুত্র গোপীচাঁদ বলছেন, "কোন্ বিরিখের বোঁটা আমি মা কোন্ বিরিখের ফল।" ময়নামতীর উত্তর— "মনবিরিখের বোঁটা তুই তন্ বিরিখের ফল।। গাছের নাম মনুহর, ফলের নাম রসিয়া। গাছের ফল গাছে থাকে, বোঁটা পড়ে খসিয়া।। কাটিলে বাঁচে গাছ, না কাটিলে মরে। দুই বিরিখের একটি ফল জাননি সে ধরে।।" ময়নামতীর গান, ইত্যাদি। সংকলক বা সংগ্রাহক কখনো নলিনীকান্ত ভট্টশালী, কখনো মুন্সী আবদুল করিম, কখনো ফয়জুল্লা ও সুকুর মামুদ। তদুপরি 'শেখ শুভোদয়া'। ষোড়শ শতাব্দীতে পাওয়া গেলেও সে তো আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা।

বৈষ্ণব পদাবলীর মতো পদনিচয় বঙ্গ ছাড়া আর-কোন পৃথিবীতে আছে! মৈথিলী বিদ্যাপতি তো এক অর্থে বৃহত্তর বঙ্গেরই। চণ্ডীদাসের পদ— "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।।" সহজিয়া সাধনার কবি চণ্ডীদাস। ১৩৬০— ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির পদও তো বাংলা। তুর্কী বিজয়ের পরেও গ্রামাঞ্চলে এ হেন সাহিত্যচর্চায় তেমন কোনো বাধা পড়েনি। রচিত হচ্ছিল একের পর এক 'মঙ্গালকাব্য'। 'পাঁচালী' বা পাঞ্চালিকা। মঙ্গালকাব্য— যেমন 'চণ্ডীমঙ্গাল', 'মনসামঙ্গাল', 'ধর্মমঙ্গাল', 'শীতলামঙ্গাল', 'ষষ্ঠীমঙ্গাল', 'বাশুলিমঙ্গাল'। এ-বঙ্গের আকাশে বাতাসে তখন ধ্বনিত হচ্ছিল— "জাগ ওহে বেহুলা সায়বেনের ঝি। তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি।।" কিংবা, "ফুল্লরা বেশাতি করে নগর বাহিরে। হাঁড়িয়া চামর বেচে চারি পাই দরে।।" তদুপরি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গাল'-এর সেই অমোঘ উচ্চারণ— "আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।।"

মুসলমান আমলে নাম পাওয়া যাচ্ছে ১২১ জন মুসলমান পদকর্তার। তার মধ্যে আরাকান রাজসভার কবি দৌলত কাজীই প্রধান। তাঁর রচনা 'সতী ময়নামতী' বা 'লোরচন্দ্রাণী'। দেবদেবী উধাও। আছে কেবল নর-নারীর সুখদুঃখ ও প্রেমগাথা। আরেক কবি আলাওল। তিনি লিখলেন হিন্দুদেরও মরমি কাব্য 'পদ্মাবতী'। দৌলত কাজী 'বজ্রবুলি'-তেও দড় ছিলেন। তাঁর পদ, "শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর। তবু মোর না জুরয়ে এ তাপ শরীর।। মদন অধিক জিনি খিজুরির রেহা। খরকএ যামিনী কম্পায় মোর দেহা।।" আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতও আছে, চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর সাহিত্যও আছে। বাংলায় প্রথম মহাভারত-কাহিনিকার কবীন্দ্র পরমেশ্বর। হুসেন শাহের সেনাপতি লস্কর পরাগল খাঁয়ের নির্দেশেই তাঁর এই 'পাণ্ডব বিজয়' নামের মহাভারত-অনুবাদ-রচনা। পরাগল খাঁয়ের পুত্র ছুটি খাঁয়ের অনুরোধে শ্রীকর নন্দীর রচনা 'অশ্বমেধ পর্ব'। তা ছাড়া, অনন্তই প্রথম অনুবাদ করেছিলেন রামায়ণ, পরবর্তীকালে কৃত্তিবাস, চন্দ্রাবতী। সেই আছে না— "বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়। পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়।।"

চৈতন্য-ভাবনায় শুধু রাম নয়, শুধু কৃষ্ণও নয়। একুনে রামকৃষ্ণ। আবার মহাভারতের গোটা কৃষ্ণও নয়, কেবলমাত্র বালকৃষ্ণ। বৃন্দাবনবিহারী গোপেষু

বাংলা সাহিত্যে সত্তর-আশি, এমনকী নব্বই দশকে যে-কজন তরুণ কথাকার 'শেকড়ের দিকে' দৃষ্টি দিয়েছেন, অন্তত চেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ও অগ্রণী অবশ্যই সোহারাব হোসেন।

তখন তরুণ।

গোপালকৃষ্ণ। স্বয়ং চৈতন্যদেব রূপগোস্বামীকে এরূপই বলেছিলেন, " কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে।।" চৈতন্যসময়ে ও চৈতন্যোত্তর কালে বঙ্গীয় বৈষ্ণবচরিত কাব্য ও পদাবলী লিখিত হয়েছে যথেষ্টই। মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেন, বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস, শ্যামানন্দ— এহ বাহ্য, আগে কহো আর! অধিকন্তু আমাদের নিধুবাবুর টপ্পা ছিল, "নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা!" আমাদের রামপ্রসাদের কালীকীর্তন ছিল। স্বর্ণলালী, মঞ্জুলালীর গান ছিল। কবির গান, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, কথকতা ছিল। দাশুরায়ের পাঁচালি ছিল। সর্বোপরি সাহিত্যচর্চার একটা বেগবান ধারা ছিল। কিন্তু হায়! ইংরেজরা এল আর 'সকল রসের ধারা' যেন মুহূর্তেই উবে গেল! আমাদের স্বকীয় সাহিত্যের ধারা স্রোতোহারা হল। আমরা ভিনদেশি সাহিত্যের আড়া-ধাড়া অনুসরণ করে অতঃপর গল্প-উপন্যাস রচনায় ব্রতী হলাম। থাকল পড়ে শুধুই আক্ষেপ:

"আমার এই বঙ্গাদেশের সুখের স্মৃতি আছে— নিদর্শন কই? দেবপাল, দেব লক্ষণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ— প্রয়াগ পর্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ীরীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? ... ইতিহাস কই? জীবনচরিত কই? কীর্তি কই? কীর্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে— সুখ-চিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে— চাহিব কোন্ দিকে?"

এত গোড়ার কথা বললাম, আসল যে-কথাটি বলব বলে— বাংলা সাহিত্যে সত্তর-আশি, এমনকী নব্বই দশকে যে-কজন তরুণ কথাকার 'শেকড়ের দিকে' দৃষ্টি দিয়েছেন, অন্তত চেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ও অগ্রণী অবশ্যই সোহারাব হোসেন। তাঁর রচিত যেকোনো আখ্যান, ভাতের হাঁড়ির ভিতর একটা ভাত টিপে দেখার মতোই, বিবেচনায় আনা যায়। আমি তাঁর 'মহারণ' উপন্যাসটিকেই আলোচনায় রাখব। কেননা, "বয়সে তরুণ

সহধর্মিণী মুনিয়া বারির সঙ্গে।

কথাসাহিত্যিক সোহারাব হোসেন বিষয় স্বাতন্ত্র্য ও আঙ্গিক পারিপাট্যের সমন্বয়ে লেখালেখির যে-জগৎটি গড়ে তুলেছেন, সেটি একান্ত তাঁর নিজস্ব। সময়চেতনা ও কালজ্ঞানের নির্যাসে তাঁর লেখ-ভুবনটি য্যামন বিশিষ্ট তেমনি দেশজ-লোকজ গঠনের অধুনান্তিক প্রয়াসে সে-ভুবন কারুকার্যময়।" 'মহারণ'-এর প্রচ্ছদের পিছনের ব্লার্বে লেখা কথাটি যথার্থই। 'সরম আলির ভুবন', 'মাঠ জাদু জানে', 'সহবাস পরবাস' পাঠেও আমার অনুরূপ অভিজ্ঞান হয়। কী আখ্যান বয়নে কী বিষয় নির্বাচনে সোহারাবের যেন পূর্বাপর নেই।

কেয়ামত এই আখ্যান তথা 'মহারণ'-এর প্রধান যোদ্ধা। কিন্তু প্রথমেই মাথায় রডের বাড়ি খেয়ে সে তালপুকুরে গড়িয়ে পড়ল। তার আগে ঘুঘুডাঙা গ্রামের তেমাথায় মিটিং বসেছিল। তাকে সাবধানও করা হয়েছিল। কিন্তু কেয়ামত শোনেনি। বলেছিল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল চাচা? ওসব গার্ড-ফার্ড তাদেরই লাগে যাদের পা আর মাটিতে নেই! আমার ওসব লাগবে না।" তবু শুভানুধ্যায়ীরা বলেছিল, "বলতিছি, এমনিই সপ ভালো, কিন্তুক কুকুর হন্যে হলি সে কোনো নিয়মনীতি মানে না! তাই—!" কারো কথা না শুনে কেয়ামত হাঁটা শুরু করেছিল। মনে তার ভরপুর বিশ্বাস, আঁধারমানিক-ঘুঘুডাঙা সমেত সারাটা এলাকায় এমন কেউ নেই যে-তাকে আঘাত হানতে পারে। কেননা, সমগ্র এলাকায় তার জনসংযোগ ছিল প্রশ্নাতীত। জন, জনসংযোগ, বিশ্বাস, বিশ্বাসহীনতা, যাদের পা মাটিতে আর যাদের পা মাটিতে নেই, এই নিয়মেই 'মহারণ', একটা রক্তাক্ত কথকতা। প্রচ্ছদের সামনের ব্লার্বের কথাটিও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য:

" এ উপন্যাসের আখ্যানে আছে তিনটি স্তর— সাম্প্রতিক সময়ের রাজনৈতিক ঘূর্ণি, বাউলের গুহ্যবাদী সাধনার দেহমুক্তিরধারা ও ফকির বিদ্রোহের অজানা ইতিকথা। ফকির-বাউলের বস্তুরক্ষার সাধনা মোহমুক্তির সাধনা আসলে প্রচল শাস্ত্রসম্মত ধর্মধারার বিপ্রতীপ একস্বতন্ত্র সভ্যতার নাম। আর এদেশীয় বামপন্থী রাজনীতির মৌলকথা হল— নির্যাতিত মানুষের মুক্তিকেন্দ্রিক পাল্টা শাসনব্যবস্থা চালু করা। উপন্যাসের নায়ক কেয়ামত এই দুই ধারাকে মেলাতে চেয়েছে। মেলাতে গিয়ে সে যেমন সাধিকা ছপুরার শিষ্য হয়ে দেহতত্ত্বের গূঢ় সাধন প্রণালীতে মেতে ওঠে, বামপন্থী রাজনীতির সুবিধাবাদের ফাঁদে পড়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তেমনি মজনু শা'র ফকির বিদ্রোহের হরেক কিসিমের পথে পথে পদচারণা করে, মেছোভেড়ি দখলের ডাক দিয়ে তার পার্টিকে আন্দোলনময় করে। বর্তমান বাংলার আঁধারমানিক-হাতিপোতা, কেশপুর-গড়বেতার বৃত্তান্ত যেমন এআখ্যানে উঠে এসেছে তেমনি দু'শ ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার বঙ্গাদেশ এ উপন্যাসের বিস্তৃতিকে পুষ্ট করেছে।— বাংলা ধ্রুপদী উপন্যাসের ঘরানায়, রূপকথা-উপক থা-লোককথার ধাঁচে রচিত 'মহারণ' এক নব সংযোজনা।"

উপন্যাসের নায়ক কেয়ামতের কাছে উল্লিখিত ত্রিস্তরের মধ্যে যাওয়া বা ত্রিস্তরকে একত্রিত করা যেমন এক কঠিন প্রয়াস, তেমনি ঔপন্যাসিক সোহারাব হোসেনের কাছেও ছিল এই ত্রিবেণীর ধারাকে জোড় লাগানোর এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। দুঃসাহসিকও বটে। সোহারাব উতরে গেছেন। রূপকথা-উপকথা-লোককথা যেমন-তেমন, তাঁর বলার কথকতার আদলে, একটা ছন্দে।

সোহারাব বাউলের গুহ্য-সাধনার দেহমুক্তির ধারা, ফকির-বাউলের বস্তুরক্ষার সাধনা, মোহমুক্তির সাধনার কথা তুলেছেন। চমৎকার মিলিয়েওছেন সাধিকা ছপুরার চরিত্রের চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে। বৌদ্ধদের সহজিয়া ধর্ম, বাউল ও সুফি সাধনা, চৈতন্যবাদের স্বকীয়া, পরকীয়া ও সহজিয়া— সব যেন একাকার। "বৈষ্ণবী শক্তিতত্ত্ব পরিবর্তিত ও বিকৃত হতে হতে ঠেকল এসে মাধুর্য-আস্বাদনে, সে মাধুর্যের আধার হল নারী, তাও স্বকীয়া নয়, পরকীয়া।"

সোহারাব কথাশিল্পীও বটেন। তাঁর কথার একটু নমুনা দিই। যা কী না প্রত্নখননের মতোই শেকড়কে খুঁজে চলে:

"দেহ-গুরু ছপুরার সঙ্গে তার শিকার-পর্বের বাতিনি ভাঙতে ভাঙতে কেয়ামত দুপুর গড়িয়ে দেয়। রোজকার মতো দুপুরের খাওয়া-দাওয়া একটু সকাল-সকালই খেয়ে নেয় সে। তেলে-ঝোলে টৈটুম্বুর খাওয়ার পর একটা লম্বা ঘুমের রং-রঙালো রাজ্যে হারিয়েও যায়। জবেরও। আর সেই অবসরে কালের সূর্য বিকেলের আকাশে ঢলে পড়ার আগে মাজেদা কথাটাকে রাস্ট্র করে দেয়। সে তার দীন-দরিদ্র বোধ নিয়েও বুঝতে সক্ষম হয়েছিল— মিতে তার গতরাতে উত্তর বিলের রাঘববোয়ালটাইকেইরাঘববোয়ালটাইকেহ সাবাড় করে দিয়েছে। দিয়েছেই তো। না হলে চ্যাং-শোল-শিঙি-মাগুর বেচে অত টাকা হয় নাকি?"

সোহারাব আর নেই! বেঁচে থাকলে সে অনেক দূরই যেতে পারত। বলতে গেলে অনেক দূর! অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল বাংলা সাহিত্যের। ভণিতা অতি বড়ো করেও সামান্য কিছু বলা হল, সময়াভাবে।

সোহারাব হোসেন ও তাঁর সংগ্রামের কাহিনি

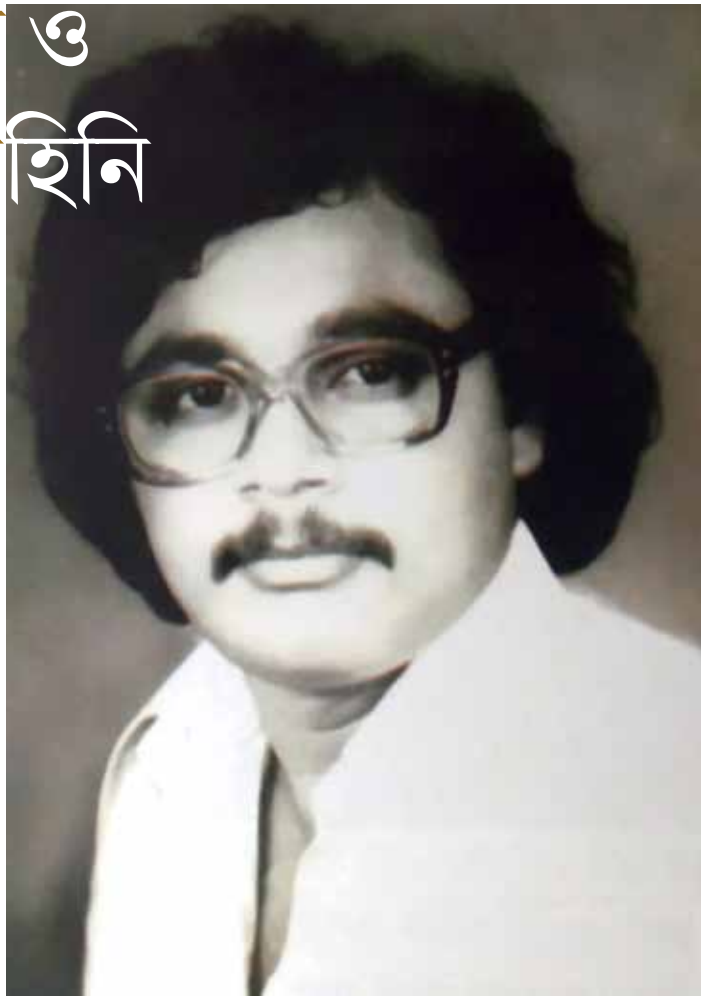

প্রথম যৌবনে।

গোলাম রাশিদ

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাটের একটি গ্রামের নাম সাংবেড়িয়া। বাবা-মা আর ছোট্ট বোনকে নিয়ে মাটির ঘরে সংসার এক কলেজ-পড়ুয়া ছেলের। দারিদ্র্য তাঁদের দাওয়ায় উঠোনে রোদের মতো খেলা করে। বসিরহাট কলেজের বাংলা অনার্সের ছাত্র। তখন বি.এ. তৃতীয় বর্ষে পড়ছেন। রোজগারের তাগিদে আর শেখার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে একটি খবরের কাগজে শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগ দিলেন স্বল্পভাষী ছেলেটি। গ্রামের ছেলে সকালে উঠে আসতেন ট্রেন ধরতে। বাড়ি ফিরতেন শেষ ট্রেনে। শেষ ট্রেন কখনো মিস করতেন না।

এই ছেলেটিই ছিলেন ক্লাস ফোরের তুখোড় ছাত্র। তাঁর শিক্ষক আবু সালেক আহমেদ তাঁকে একটা বই দিয়ে বললেন, "যা মুখস্থ করে ফেল।" সত্যি সত্যিই বইখানা মুখস্থ করে ফেললেন। সেটা সাতের দশকের কথা। তখন সেন্টার পরীক্ষা নামে একটি পরীক্ষা হত, যার সিট পড়ত অন্য কোনো স্কুলে। আর সেই সেন্টার পরীক্ষায় বসিরহাট পশ্চিম সার্কলে ছেলেটি প্রথম হন। এই ছেলেটিই পরে হয়ে উঠবেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা কথাকার। তিনি সোহারাব হোসেন। আমিনা বেগম ও রুস্তম আলির সন্তান সোহারাবের জন্ম ২৫ নভেম্বর ১৯৬৬ সাল।

আর-দশটা গ্রামের ছেলের মতোই কেটেছিল সোহারাবের শৈশব। ছোটোবেলায় সোহারাব ছিলেন গ্রামের চঞ্চল ছেলেদের মতোই দুস্টু। আর ছিল নেতৃত্ব দেওয়ার সহজাত গুণ। তাই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলার সময় 'সোরাব' ছিলেন সর্দার। মার্বেল খেলায় ওঁর জুড়ি মেলা ভার। নিশানা মিস হত না প্রায়-সময়ই। এককথায় পাকা ছেলে। তাই বলে দায়িত্ববোধের কিন্তু অভাব ছিল না। প্রাইমারি স্কুলঘরের চাবি থাকত তাঁর কাছে। সঠিক সময়ে ঘর খোলার গুরুদায়িত্ব পালন করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে। স্বাধীনতা দিবস কিংবা প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন সন্ধ্যায় পতাকা নামিয়ে ভাঁজ করে তুলে রাখার দায়িত্বও অবহেলা করেননি কখনো।

শৈশব কাটিয়ে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিসময়ে এলেন যখন, তখন তাঁর চোখে অনেক স্বপ্ন। কবিতা লেখেন। বেরিয়েছে কাব্যগ্রন্থ 'বৃষ্টির নামতা'। ছাত্রাবস্থাতেই বের করেছেন 'গাঙ' নামের একটি লিটল ম্যাগাজিন। ছাত্রজীবনেই সোহারাব ঢুকে পড়েন সাহিত্যের অন্দরমহলে, শুরু হল সাফল্যের সিঁড়ি ভাঙা।

বসিরহাট কলেজের কৃতি ছাত্র সোহারাব এম.এ. পড়ার জন্য ভর্তি হলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য তাঁর অধ্যয়নের বিষয়। তখন থেকেই

নাগরিক জীবনের সঙ্গে ওঠা-বসা শুরু হল তাঁর।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ড মেডালিস্ট সোহারাব এম.এ. পাস করার পর গবেষণা শুরু করলেন। বিষয়: বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন (১৯০১—১৯৯০)। গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকল লেখালেখি। এতদিন কবিতা লিখেছেন। এবার গল্প। এক ভিন্ন আখ্যান, পরিধি আর ভাষা, সঙ্গে মনস্তত্ত্বের মিশেল। আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার মুহূর্তেই প্রবেশ করলেন জীবনের দ্বিতীয় পর্বে। বিয়ে করলেন দীর্ঘ দিনের আপনজন মুনিয়া বারিকে। শুরু হল যৌথ পথচলা। এ-পথের শেষ কোথায়?

তাঁর পেশাগত জীবন কবে থেকে শুরু? তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, কারমাইকেল হস্টেলে থাকতে শুরু করেন, তখন থেকেই তাঁর পেশাগত জীবন শুরু হয়ে যায়। রাত তিনটে-চারটে পর্যন্ত তিনি পড়াশোনা করতেন। পুরোনো প্রশ্নপত্র, স্যারেদের সাজেশন দেখে সম্ভাব্য প্রশ্ন তৈরি করতেন। লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসতেন রেফারেন্স বই। নোট বানাতেন। নোট বানানো তো তেমন অর্থকরী নয় কিছু। কিন্তু সোহারাব সেটাই করতেন। যাঁরা প্রাইভেট কোর্সে এম.এ. পরীক্ষা দেবেন, তাঁদের কাছে সে-নোট বিক্রি করতেন। নগদ টাকায়। তাঁর বাবা তখন কলেজ স্ট্রিটে এক ফলের আড়তে কাজ করতেন। আয় ছিল সামান্যই। সোহারাব সেটা বুঝতেন ভালোভাবেই। তাই নিজেই কিছু রোজগার করে পড়াশোনার খরচ চালানোর চেষ্টা করতেন।

এর আগে সোহারাব কিছুদিনের জন্য সাংবাদিকতা করেছেন। ১৯৮৮-র শেষ দিকে সোহারাব 'বর্তমান' পত্রিকায় ট্রেনি জার্নালিস্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন। রিপোর্টার ছিলেন তিনি। প্রচণ্ড খাটুনির কাজ ছিল। কোনো কিছু শেখার অদম্য ইচ্ছা তাঁর মধ্যে ছিল। তাই সকালে বেরিয়ে এসে সারাদিন কাজ করে শেষ ট্রেনে ঘরে ফিরতেন। আবার কোনোদিন থেকেও গেছেন অফিসের ওপরে। সেখানে একটা ঘুমোনোর জায়গা থাকত। সোহারাব এই কাজ ১৯৮৯-এর প্রথম দিকেই ছেড়ে দেন। ট্রেনি হিসেবে যা বেতন পেতেন, তার থেকে বেশি খাটুনি ছিল। পড়াশোনার সময় পেতেন না। সোহারাব মনোযোগী পড়ুয়া। কেন এত ত্যাগ স্বীকার করবেন? অতএব, 'বর্তমান'-এ পাততাড়ি গুটিয়ে একদিন চলে আসেন। তাঁর এই চলে আসা চলে যাওয়া নয়। কারণ, সংবাদপত্রের এক বিশাল জগৎ থেকে চলে গেলেও সাহিত্যের এক বিশাল জগৎ তাঁর সামনে খুলে গিয়েছিল। সেই দরজা দিয়ে ঢুকেছিলেন অনন্ত নক্ষত্রবীথির মধ্যে।

এম.এ. পাস করে বি.এড.-এ ভরতি হন। টিউশন পড়ানো শুরু করেন। এ যেন বাঙালির এক কুটির-শিল্প। অনার্স, এম.এ. কিছুই বাদ দেননি তিনি। সবাইকে পড়াতে শুরু করেন যত্নসহকারে। কিন্তু এটা লেখার কী প্রয়োজন? আসলে সোহারাব যে পরবর্তীকালে একজন জনপ্রিয় শিক্ষক হয়ে উঠবেন, তার পটভূমি এখানেই রচনা হতে শুরু করে। তাঁর পড়ানোর স্টাইল, টেকনিক, মৌলিকতা সবকিছুই ছিল নতুনত্বে মোড়া। এই সময় আংশিক সময়ের অধ্যাপকরূপে যোগ দিলেন বসিরহাট কলেজে। সালটা ১৯৯১। দু-বছর এখানে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পড়িয়েছেন। কলেজে সেই সময় পার্ট টাইম শিক্ষকদের অনার্স ক্লাস দেওয়া হত না। সোহারাব হোসেন সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে সকলের মন জয় করে নেন। তাঁর পড়ানোর কৌশল জনপ্রিয়তা পায়। কলেজ তাঁকে অনার্সের ক্লাস দিতে বাধ্য হয়।

এরপর সোহারাব স্কুলে স্থায়ী চাকরি পেলেন। এটা অতি আনন্দের ছিল তাঁর জন্য। যেখানে কৈশোরকালের একটা মূল্যবান অংশ কেটেছে, রঙিন জীবনের স্বপ্নের দেখা মেলে যে-ময়দানে, সেই ধান্যকুড়িয়া হাই স্কুলে তিনি শুরু করলেন পেশাগত জীবনের প্রথম পর্ব। বাংলার শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতা করেছেন এখানে।

পি.এইচডি. শেষে অধ্যাপক হিসেবে কলকাতার আনন্দমোহন কলেজে যখন যোগদান করলেন তখন সালটা ১৯৯৬। এই বছরেই বেরোবে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'দোজখের ফেরেস্তা'। চমকে দিলেন সায়েব আলির স্রষ্টা। সে কবর খোঁড়ে। আর এই কবর খোঁড়ার সময় নাকে আসে মৃতদেহের গন্ধ। গন্ধের ধরন দেখে সে বুঝতে পারে, মুর্দা দোজখে যাবে, না বেহেশতে। গল্পের শেষে সায়েব আলি দেখে তাঁর নিজের না-মরা দেহ থেকেই পচা গন্ধ বেরোচ্ছে।

তাঁর পড়ানোর খ্যাতি এই সময় আরও ভালোভাবে চাউর হতে থাকে। এই শিক্ষকতা করার সময় তাঁর জীবনের বহু স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে। শিক্ষক হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তাঁর নিজস্ব বিভাগে 'বারসার ক্লাসরুম' ভরে উঠল উৎসুক ছাত্র-ছাত্রীদের আগমনে। সবকিছু মিলিয়ে বন্দনার দুয়ারে গিয়ে পৌঁছোলেন তিনি। সেসব লিখতে গেলে বহু ঘটনা চলে আসবে।

অল্প বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়েন। দিনে চার বার ইনসুলিন নিতেন, কিন্তু পড়ানো ছাড়তেন না। বলতেন, "ক্লাস নেওয়াটা আমার কাছে উপাসনা।" তাই তাঁর ছাত্রদের অনেকেই অকপটে বলে ওঠেন, তাঁদের বেড়ে ওঠা জীবনে 'সোহারাব স্যার' সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। জীবনে তিনি অনেক প্রশংসা, খ্যাতি, পুরস্কার অর্জন করেছেন। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে 'সোহারাব স্যার' যে সম্মান ভালোবাসা পেয়েছেন, তার তুলনা হয় না।

শৈশব কাটিয়ে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিসময়ে এলেন যখন, তখন তাঁর চোখে অনেক স্বপ্ন। কবিতা লেখেন। বেরিয়েছে কাব্যগ্রন্থ 'বৃষ্টির নামতা'। ছাত্রাবস্থাতেই বের করেছেন 'গাঙ' নামের একটি লিটল ম্যাগাজিন।

আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। অতিথি অধ্যাপক হিসেবে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজ, রামমোহন কলেজ-সহ বহু জায়গায় পড়িয়েছেন।

তাঁর বর্ণবহুল পেশাগত জীবনের শেষ অধ্যায় হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি পদে যোগ দেওয়া। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি এই কাজে যোগ দেন। কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার তাঁর ছোটা শুরু হল। মাদ্রাসা-শিক্ষার পুনর্গঠনে তাঁর ভূমিকা যথেষ্ট। একটা ঘুমন্ত জাতিকে জাগাবার জন্য তিনি এগিয়ে এসে ব্যাটন তুলে নিলেন। ঢুকলেন মুসলমান সমাজের একেবারে অন্দরে। তাঁদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশলেন। তিনি একজন লেখক। আগেও তিনি তার অর্জুনের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন সমাজকে। এবার তিনি তা দেখলেন বৃহত্তর রূপে। দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা— বাংলার মুসলমানদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ হল তাঁর কাছে। আর তাঁর উপলব্ধি হল অনন্য। যে কাউকে নাড়া দেবে তাঁর এই কথাগুলো— "গতানুগতিক ধর্মাচরণ আমার ভালো লাগে না। ইসলাম ও মুসলমানের মধ্যে আমার কাছে আগে মুসলমান, পরে ইসলাম। আমি মুসলমানের ভালো চাই। চাই মুসলমান সুস্থ-সুন্দর-শুভ ও সংস্কৃতিমনস্ক হোক। মুসলমান সুন্দর হলে ইসলামের ভালো হবে। ইসলাম ভালো, শাশ্বত। কিন্তু সমাজে ভালো মুসলমান না তৈরি হলে ইসলামকে কেউ ভালো বলবে না।"

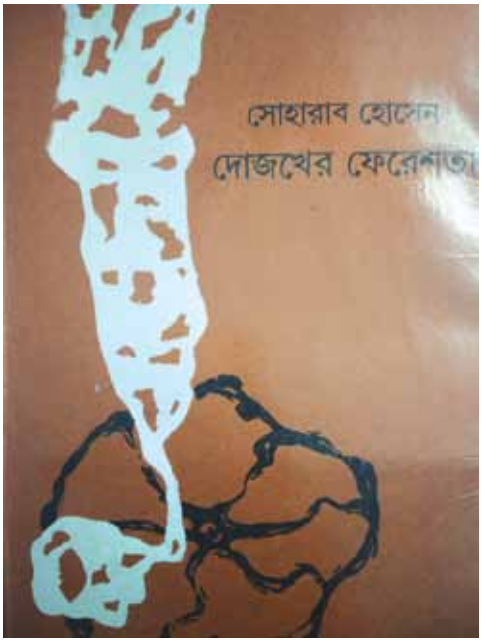

সোহারাব হোসেন লেখালেখি শুরু করেন কবিতা দিয়ে। 'কাফেলা' ও 'নতুন গতি' আটের দশকে তখন রমরমিয়ে চলছে। আবদুল আজীজ আল আমানের নেতৃত্বে বসছে শেষ রোববারের সাহিত্য আসর। তারুণ্য আর অভিজ্ঞতার মিশেলে তৈরি হচ্ছে এক নতুন অঙ্গান। সেখানে সোহরাবের উপস্থিতি ছিল। 'কাফেলা' ও 'নতুন গতি'র পুরোনো সংখ্যা খুঁজলে স্কুলছাত্র সোহারাবের লেখা মিলতেই পারে।

কিন্তু কথাসাহিত্যই যেন তাঁর আপন জগৎ। নব্বই দশকের পর তেমন একটা কবিতা লেখেননি। তবে অল্প সময়ের কবিতাচর্চায় তিনি যে-স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা হেলাফেলা করবার মতো নয়:

"তমাল-তরু আবরণে কাঁচুলির আভা
ফোটে লতানো ঘুমের দেশে,
আজ এই বাংলায় চটকল শ্রমিকের পা
ঘেঁসে জন্মায় নবীন ঘাস,
সিদ্ধ-পুরুষ মুনির সাধনায় ঘামজলের
ফোঁটা পড়ে দুরন্ত বালকের
বাঙালির তপোবনে চরে আজ বিষ্ঠাময়
এ যুগের লাশ।"

১৯৮৭-তে প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রক্তদেহে অন্যস্বর'। এর পরের বছর 'বৃষ্টির নামতা'। এই দু-খানা কবিতার বই ও কিছু অগ্রন্থিত কবিতা দিয়ে পরবর্তীকালে 'কবিতা সংগ্রহ' সংকলনটি প্রকাশিত হয়।

এবার আসি গল্প-উপন্যাসের কথায়। তাঁর কাহিনি জুড়ে থাকে আমাদের না-দেখা মানুষেরা, তাদের সংলাপ আর মনের জটিল আবর্ত। প্রথমেই চলে আসে তার মহাকাব্যিক উপন্যাস 'মহারণ'-এর কথা। 'মহারণ'-এর পটভূমি বিস্তৃত। 'মহারণ' খুব অল্প বয়সের লেখা। এই উপন্যাসে সোহারাব দেখিয়েছেন মালিক শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব। যা যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছে। এক রাজা যায়, অন্য রাজা আসে। সোহারাবের গল্প বলার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি অতীতচারী। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি বর্তমানে প্রয়োগ করেন।

'মহারণ'য়েই শুধু নয়, 'সরম আলির ভুবন', 'মাঠ জাদু জানে', 'সওকাত আলির প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি', 'গাঙ বাঘিনী', 'আরশি মানুষ'-সহ প্রায় সব উপন্যাসেই মিথকে তিনি উপর্যুপরি ব্যবহার করেছেন, অতীত ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের ব্যঞ্জনাকে মিলিয়েছেন, বলেছেন অন্ত্যজ মানুষের জীবনের কথা। বসিরহাট, সুন্দরবনের গ্রামের মানুষের মুখের ভাষা ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়।

সোহারাব হোসেন সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে লিখেছেন সমালোচনাধর্মী গ্রন্থও। 'বাংলা ছোটগল্প: তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি' এমনই একটি বই। তাঁর লেখা গল্প পাঠ্য হয়েছে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে। 'সোহারাব হোসেন: নির্মাণ ও সৃষ্টির অসীমান্তিক শিল্পী'— এই বিষয়ে গবেষণাও করেছে তৌসিফ আহমেদ নামে এক গবেষক।

'আরশি মানুষ' তাঁর শেষ উপন্যাস। একটা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বের হচ্ছিল। ছকভাঙা ন্যারেটিভে বরাবরই তিনি আমাদের চমকে দিয়েছেন। 'আরশি মানুষ'ও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' কতদিন হাতে নিয়ে বসে থেকেছি। ভেবেছি এমন গল্প উনি কেমন করে লেখেন। জীবনকে এমন নির্মোহ, কাব্যিকভাবে দেখা যায়? তিনি দেখেছেন। তিনি পেরেছেন।

সোহারাবের শেষজীবন কেটেছে খুব ভয়ংকরভাবে। তিনি বলতেন, "ডায়াবেটিসে চোখদুটো গেছে প্রায়। কিছুই প্রায় দেখতে পাই না। চিকিৎসা করাচ্ছি। রেজাল্ট তেমন কিছু হচ্ছে না। আমি অন্ধত্ব মেনে নিয়েছি। সেভাবে নিজেকে তৈরি করছি।"

পি.এইচডি. শেষে অধ্যাপক হিসেবে কলকাতার আনন্দমোহন কলেজে যখন যোগদান করলেন তখন সালটা ১৯৯৬। এই বছরেই বেরোবে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'দোজখের ফেরেস্তা'।

কথাকার হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্ট চরিত্র শুভ্রের মতো তিনি ধীরে ধীরে অন্ধ হতে থাকেন। চোখের আলো কমে যেতে থাকে। তাঁর কথনে লিখে যেতে থাকেন সহধর্মিণী মুনিয়া বারি— এক যোগ্য সাথি। এমনও হয়েছে, সোহারাব কারও দিকে চেয়ে আছেন। অথচ তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি হয়তো ভাবছেন সোহারাব তাঁকে গুরুত্ব দিলেন না। এমন ভুল বোঝাবুঝিও হয়েছে। বড়ো কষ্টে কাটিয়েছেন শেষের দিনগুলি। সোহারাব কি জানতেন, তাঁর শেষের দিন আসতে বেশি দেরি নেই? তাই হয়তো প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলেন। তাঁকে যে অনেককিছু করে যেতে হবে। তাই তিনি রাত তিনটে পর্যন্ত লিখে যেতেন। সৃষ্টির তাড়না তাঁকে ঘুমোতে দেয়নি। তবু তাঁকে ঘুমোতে হল। চিরদিনের জন্য ঘুমোতে হল। অকালে তাঁর মৃত্যু হল ২০১৮-র ২ মার্চ।

রচনাপঞ্জি

কবিতার বই

১. রক্তদেহে অন্যস্বর, ১৯৮৭
২. বৃষ্টির নামতা, ১৯৮৮
৩. কবিতা সংগ্রহ ১, ২০১৩

গল্পের বই

১. দোজখের ফেরেশতা, ১৯৯৬
২. বায়ু তরঙ্গের বাজনা, ২০০২
৩. বোবাযুদ্ধ, ২০০৭
৪. সাহিত্যের সেরা গল্প, ২০০৭
৫. আয়না যুদ্ধ, ২০০৮
৬. আমার সময় আমার গল্প, ২০০৮
৭. সুখ সন্ধানে যাও, ২০০৯
৮. শ্রেষ্ঠ গল্প, ২০১০
৯. নির্বাচিত গল্প, ২০১০
১০. ভেজা তুলোর নৌকা, ২০১৭

উপন্যাস

১. ছায়া মানুষ, ১৯৯৮
২. মহারণ, ২০০৩
৩. সরম আলির ভুবন, ২০০৪
৪. মাঠ জাদু জানে, ২০০৪
৫. সহবাস পরবাস, ২০০৭
৬. রাজার অসুখ, ২০০৮
৭. বদলি বসত, ২০০৯
৮. সওকাত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি, ২০০৯
৯. দহনবেলা, ২০১০
১০. গাঙ বাঘিনি, ২০১১
১১. দ্বিতীয় দ্রোপদী, ২০১২

১২. সঙ্গ বিসঙ্গ, প্রথম খণ্ড ২০১৩, দ্বিতীয় খণ্ড ২০১৫
১৩. আরশি মানুষ, ২০১৫

আলোচনা ও প্রবন্ধের বই

১. শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা, ১৯৯৯
২. বাংলা ছোটগল্প: তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি (তিন খণ্ড), ২০০৯-২০১১-২০১৪
৩. বাংলা ছোটগল্পে বাস্তববোধের বিবর্তন, ২০১৪
৪. জনজাগরণের উপন্যাস অরণ্যের অধিকার, ২০০৫
৫. বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন, ২০০৪
৬. ছোটগল্প পরিক্রমা, ২০০৫
৭. চেনা মুখ অচেনা পাণ্ডুলিপি, ২০১০
৮. প্রবন্ধ সমীক্ষা, ২০০৬
৯. সহজ বাউল, ২০১৭
১০. অলীক মানুষ উপন্যাসের অন্দর বাহির, ২০১৬
১১. শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ, ২০১৮
১২. কথাসাহিত্যের অরূপ মহারূপ, ২০১৮

ছোটোদের বই

১. কল্পতরু গল্পতরু, ২০০৩
২. রূপকথার পুতুল, ২০০৮
৩. ভূতপিসের ডাক, ২০০৯
৪. ফটিক বারি যাচে রে, ২০১০
৫. জম্পেসদার ভূতপরী অভিযান, ২০১০
৬. গুঁফো বুড়োর কান্না, ২০১১

সম্পাদিত বই

১. পথের পাঁচালি, ২০১১
২. বিষাদ সিন্ধু, ২০১২
৩. অশনি সংকেত, ২০১২
৪. জমিদার দর্পণ, ২০১৫

জীবনপঞ্জি

জন্ম: ২০ নভেম্বর ১৯৬৬ (নদীয়া, মামার বাড়ি)।
বাবা: রুস্তম আলি সরদার।
মা: আমেনা বিবি।
গ্রাম: সাংবেড়িয়া। থানা: বসিরহাট। জেলা: উত্তর চব্বিশ পরগনা।
লেখাপড়া: ধান্যকুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়, বসিরহাট কলেজ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, ১৯৮৯। পিএইচ.ডি.।
বিবাহ: ১৯৯৪।
স্ত্রী: মুনিয়া বারি।
পেশা: অধ্যাপনা।
জীবনাবসান: ২ মার্চ ২০১৮।

গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকার: পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি (সেপ্টেম্বর ২০০৬থেকে ডিসেম্বর ২০১০)।পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা

পর্ষদের সিলেবাস কমিটির প্রধান সদস্য (২০০২—২০০৬)।

পুরস্কার: ১. হরেন্দ্রনাথ সাহা স্মৃতি দিবারাত্রির কাব্য পুরস্কার, ১৯৯৭। ২. সোমেনচন্দ্র স্মারক পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯। ৩. সর্বভারতীয় কথা পুরস্কার, ২০০০। ৪. নজরুল সাহিত্য সম্ভাবনা পুরস্কার, ২০০০। ৫. অন্তর্বীজ সাহিত্য পুরস্কার, ২০০৩। ৬. ভাষা শহিদ বরকত পুরস্কার, ২০০৩। ৭. আলোক পুরস্কার, ২০০৪। ৮. ইলাচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার, ২০০৮। ৯. নতুন গতি পুরস্কার, ২০০৯। ১০. সিরাজুল হক স্মৃতি সাধনা পুরস্কার ও স্বর্ণপদক, ২০০৯। ১১. মীর মোশাররফ হোসেন সত্যের দিশারী পুরস্কার, ২০০৯। ১২. পঞ্চাশে পা মুসাউয়র স্মৃতি পুরস্কার ও স্বর্ণপদক, ২০১৫।

সূত্র: 'সোহারাব হোসেন: জীবন ও সাহিত্য', সম্পাদনা: ড. আব্দুর রহিম গাজী ড. তৌসিফ আহমেদ, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, ২০১৮।

গত তেত্তিরিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। পড়াশোনায় সাফল্যের পর তাঁরা দেশে-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অথবা গবেষণায় ব্যস্ত। সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে। এই সংখ্যায় চিকিৎসক-অধ্যাপক

সানোয়ার সেখ

জীবনের গল্প, গল্পের জীবন

আসাদুল ইসলাম

ধীর পায়ে মঞ্চে উঠে এলেন তিনি। মাঝারি উচ্চতা। রং চাপা। ফুল স্লিভ সার্ট, ট্রাউজার, স্যু। চেহারায়, পোশাকে কোথাও কোনো অসাধারণত্বের সামান্য চিহ্নও নেই। মাইক্রোফোনের কাছে এলেন, প্রেক্ষাগৃহের সব আলো এক-এক করে নিভে গেল। বিশাল মঞ্চে তখন জ্বলছে একটিমাত্র আলো। সে-আলো এসে পড়ছে তাঁর মুখের ওপর। সেই মুখ থেকে উৎসারিত আলো ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে। বিশাল মঞ্চে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। একা। হল ভর্তি কয়েক শো জোড়া চোখ দৃষ্টি ফেলেছে তাঁর মুখের ওপর। শ্রোতাদের বেশিরভাগই ছাত্র-ছাত্রী। বক্তা কোনো বিখ্যাত মানুষ নন, বীরভূম জেলার নলহাটী থানার ভদ্রপুর গ্রামের সানোয়ার সেখের নাম আগে কেউ শুনেছে বলে মনে হয় না। তাঁর কথা শোনার জন্যই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শিরোনাম 'সানোয়ার সেখ: জীবনের গল্প গল্পের জীবন'। গল্প বলা শুরু করলেন তিনি, ঠিক গল্প নয়, তাঁর জীবনের কথা।

"গুছিয়ে কথা বলাও একটা শিল্প। সে-শিল্পের কারিগর নই আমি। মঞ্চে বক্তব্যও তেমন রাখিনি কোনোদিন। তাই জানি না ঠিকমতো বলতে পারব কি না।" শ্রোতাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করলেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড পরে চোখ খুলে বললেন, "কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না। প্রথমে আমি যেখানে জন্মেছি সেই ভদ্রপুর গ্রামের কথা বলি। বীরভূম জেলার নলহাটী থানার অন্তর্গত ভদ্রপুর গ্রামটি। কলকাতা থেকে দূরত্ব প্রায় ২৩০ কিমি। হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে নামতে হয় নলহাটী বা রামপুরহাট স্টেশনে। ওখান থেকে মালদা-মুর্শিদাবাদগামী বাসে চড়ে নগরা স্টপেজে নেমে টোটো ধরতে হয়। টোটোতে ৩ কিমি গেলে ভদ্রপুর চলে যাওয়া যাবে। আমাদের পাড়ার নাম মীরপাড়া। আমাদের গ্রামে পাশাপাশি দুটোমাত্র মুসলমানপাড়া। পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ গ্রামে যেমন মুসলমানরা প্রতিবেশীদের তুলনায় শিক্ষাদীক্ষায় আর্থিকভাবে পিছিয়ে আছে, ভদ্রপুরও তার ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে থাকার প্রধান কারণ আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়া। প্রান্তিক চাষি, ভাগচাষি আর কৃষিশ্রমিক— এমন পরিবারই বেশি আমাদের গ্রামে। এখন অনেকে রাজমিস্ত্রির কাজ করছে। মাধ্যমিক দেওয়ার আগেই পড়াশোনা ছেড়ে রাজমিস্ত্রির কাজে ভিন রাজ্যে চলে যাচ্ছে ছেলেরা। দু-চারজন হাতের কাজও শিখছে। মোটকথা, পড়াশোনা করে বড়ো কিছু করব এই ভাবনা নেই বললেই চলে। এমন পরিবেশ থেকে কীভাবে ছিটকে এসে আমি আলাদা হয়ে উঠলাম, সে-কথা ভাবতে গেলে অবাকই লাগে।

আমাদের পরিবারের কথা বলি এবার। চিকিৎসা শাস্ত্রে এম.ডি. করে অধ্যাপনা করছি বলেই আপনাদের সামনে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আজকের দিনে এই অর্জন বড়ো কিছু নয়, কিন্তু আমার জীবন আর আমাদের পরিবারের নিরিখে তা কম বড়ো অর্জন বলে মনে হয় না। দাদাজি তাজেল সেখ পড়াশোনা জানতেন না। দিনমজুরি করে জীবন কাটিয়েছেন। আমার আব্বা তানজেল সেখও সেই পরম্পরা ভাঙতে পারেননি। পড়াশোনা আর জীবিকার ক্ষেত্রে তাজেল সেখ আর তানজেল সেখ ছিলেন একই পথের যাত্রী। মা নূরজাহার বিবি নিরক্ষর হলেও তাঁর প্রচেষ্টা না থাকলে আমার কিছুই হওয়া হত না। দাদাজি, আব্বা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, মা আজও আমার এগিয়ে চলার দিশা। মায়ের দারিদ্র্যক্লিষ্ট মুখটা ভেসে উঠলেই মনে হয়— আরও অনেক পথ হাঁটতে হবে। অক্ষর, শব্দের সঙ্গে পরিচয়হীন পরিবারে

জন্মেছি আমি, বাবা-মায়ের পঞ্চম সন্তান। ছ-ভাই-বোনের মধ্যে বোন সবার ছোটো। সে-ই মাধ্যমিক পাস। বাকি চার দাদার মধ্যে সর্বোচ্চ পড়াশোনা করার মান হল ক্লাস সিক্স পর্যন্ত। কৃষিশ্রমিক আব্বার খুব কম পড়াশোনা করা ছেলেদের ভালো কোনো পেশায় যাওয়ার কথা নয়, যেতেও পারেননি কেউ। দর্জি, দিনমজুরি, রাজমিস্ত্রি, এম্ব্রয়ডারির কাজ করে জীবন কাটানো দাদাদের এক ভাই আপনাদের সামনে কথা বলার সুযোগ পেয়েছে চিকিৎসক-অধ্যাপক হওয়ার সুবাদে। দু-চারটে ব্যাতিক্রম ছাড়া আজও দিনমজুরের ছেলেকে দিনমজুরিই করতে দেখি আমরা। তাজেল সেখের ছেলে তানজেল সেখ, তানজেল সেখের ছেলে, আমার দাদা, আনারুল সেখ দিনমজুর। সানোয়ার সেখেরও আর-একটা তানজেল বা তাজেল সেখ হওয়ারই কথা, জীবন শুরুও হয়েছিল সেভাবেই, কিন্তু শেষ অবধি সে-হিসেব মেলেনি। নিরক্ষরতা, দিনমজুরির পারিবারিক পরম্পরা ভেঙে ডাক্তার হয়েছি, কলেজে পড়াচ্ছি— এই উত্তরণ সহজ নয় যে কেউ বলবেন, কিন্তু কীভাবে সম্ভব হল? অসম্ভবকে সম্ভব করার লড়াইয়ের গল্প অনেক লম্বা।

অনেকেই শৈশবের স্মৃতি খুব বেশি মনে রাখতে পারেন না বলে শুনি, কিন্তু আমি চোখ বন্ধ করলেই শৈশবের প্রতিটা দিন স্পষ্ট দেখতে পাই। বীরভূমকে বলা হয় রাঙামাটির দেশ। বীরভূমে বাড়ি হলেও আমাদের জীবনে কোনো রং ছিল না। আব্বা সামান্য উপার্জন করে মায়ের হাতে তুলে দিতেন। মা ম্যানেজ করতেন। কীভাবে যে সামান্য অর্থে তিনি ম্যানেজ করতেন আজ ভেবে কূল পাই না। দিনমজুরি করতেন আব্বা। অপরের কাছে দৈহিক শ্রম বিক্রি করতেন। আমাদের কোনো জমিজমা ছিল না। আব্বা অপরের জমিতে কাজ করার পাশাপাশি নিজেও কিছু ভাগচাষ করতেন। অপরের জমি চাষ করতে গিয়ে কিছুই প্রায় বাঁচত না। এমনিতেই কৃষি খুব সামান্য লাভের একটি জীবিকা। অপরের জমি চাষ করায় অর্ধেক ফসল জমির মালিককে দিয়ে দিতে হত। চাষের সার-ওষুধের খরচ মিটিয়ে তেমন কিছুই থাকত না। যাতে চাষ থেকে কিছু পাওয়া যায়, তার জন্য আমরা সবাই আব্বার সঙ্গে খেতে কাজ করতে চলে যেতাম। দাদারাও সবাই তখন খুবই ছোটো, তাই অন্যের জমিতে খেটে যে কিছু রোজগার করবেন সে-উপায়ও ছিল না। পৃথিবীর মানুষের আদিম পেশা হল কৃষিকাজ ও পশুপালন। কৃষিকাজ দিয়ে যা আসত বাকিটা পূরণ করার জন্য পশুপালন ছিল আমাদের বড়ো ভরসা। হাঁস-মুরগি, গোরু, ছাগল পোষা হত। আমার যখন আট-দশ বছর বয়স, তখন আমি চাষের কাজে শুধু জল-খাবার নিয়ে যাওয়া ছাড়া কিছু করতে পারতাম না। তখন গোরু-ছাগল চরানো, ঘাস কাটার কাজ আমাকে করতে হত। আর ছিল জ্বালানি জোগাড় করার ভার। ভাগচাষ করে আমরা যে-ধান পেতাম, তা দিয়ে সারাবছরের ভাতের ব্যবস্থা হত না। কিছু ধান কিনে নেওয়া হত। বাড়িতেই ধান সিদ্ধ-শুকনো করে চাল করার ব্যবস্থা করতেন মা। দৈনিক বাজার-দোকান বা পড়াশোনার খরচ আসত গোরু-ছাগল, হাস-মুরগি পালন থেকেই। বাড়িতে দু-বেলা ভাত হত। সূর্য যখন পশ্চিম-আকাশে হেলে পড়ত অনেকটা তখনও দুপুরের ভাত হত না। সকাল থেকে আমাদের 'দুপুরের ভাত' হওয়ার দীর্ঘ সময় কেটে যেত ভাঙা চালের ভাত, যাকে আমরা খুদ সেদ্ধ বলি, তা খেয়ে।

আমাদের বাড়ি, সেই পুরোনো মাটির বাড়ি আজও দাঁড়িয়ে আছে। উপর-নীচ করে চার কামরা মাটির দেয়াল আর খড়ের ছাউনি দেওয়া বাড়ি। প্রতি বছর নতুন খড় দিয়ে ঘর ছাইতে হত। কোনো কোনো বছর ছাওয়া যেত না। চাঁদের আলো দুয়ারে এসে পড়লে যেমন মন ভালো হয়ে যেত, তেমনি বর্ষার জল পড়ে মাটির মেঝে তো ভিজতই, তার সঙ্গে ভিজে যেত বুকটাও। এরকম বাড়িতে বিদ্যুতের আলো থাকার কথা না। আমাদেরও ছিল না। লম্ফের আলো দিয়েই আমরা আলোকিত করেছি শৈশব-কৈশোরের জীবনকে। বছরে একবার মাত্র পোশাক পেতাম আমরা— ইদের সময়। আলাদা করে সারাবছর আর কিছু হত না। পর পর দু-বছরের ইদের জামাই হল 'তুলে রাখা' জামা। স্কুলের সময় একটা স্কুলের পোশাক ছিল। স্কুলের সময়টা পার হয়ে গেলে সারাদিন তো জামা না পরলেও চলে যায়, আমরাও সেভাবেই চলতাম।

বাড়ির খুব কাছেই ছিল আমার স্কুল। হাঁটাপথে দু-মিনিট গেলে প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল। এত কাছে স্কুল হলেও তার কোনো প্রভাবই পড়েনি, ক্লাস সিক্স পর্যন্ত যতটা সময় স্কুলে কাটাতাম তার চেয়ে অনেক বেশি সময় কাটত মাঠে গোরু-ছাগল চরিয়ে আর খেলাধুলা করে। স্কুলের দিনে সকালে-বিকালে আর ছুটির দিন সারাদিন মাঠে পড়ে থাকতাম। স্কুলে যাওয়া, সন্ধ্যায় একবার বই খুলে বসা— এটা ছিল নাম কা ওয়াস্তে। সন্ধ্যায় প্রতিদিন পড়তে বসেই ঘুমে ঢুলে পড়তাম। বাড়িতে তেমন কেউ ছিল না যে জোর দিয়ে পড়ার কথা বলবে। অনেক সময় যখন মাঠে যেতে না চেয়ে পড়াশোনার, স্কুল যাওয়ার অজুহাত দিতাম, দাদারা বলতেন, পড়াশোনা করে কি উকিল-ব্যারিস্টার হবি? তাঁরা ঠিকই বলতেন, কারণ, পড়াশোনা করা আমাদের মতো পরিবারের কাছে বিলাসিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এরকম পরিবারের বেশিরভাগ ছেলে-মেয়ের পড়াশোনায় ভালো হওয়ার কথা নয়। আমিও তার ব্যতিক্রম ছিলাম না। প্রাইমারি স্কুলে শুধু কবিতা-ছড়া মুখস্থ করা ছাড়া কিছুই শিখতে পারিনি। ঘষে ঘষে পাস করা বলতে যা বোঝায় ঠিক সেভাবেই ফাইভ পার হলাম। ক্লাস সিক্সে গিয়ে ফেল করে গেলাম। অমনোযোগী শেষ বেঞ্চে বসা ছাত্র ছিলাম, তবুও ফেল করে যাওয়াটা মেনে নিতে পারিনি। মনে আছে, স্পষ্ট সে-দিন কেঁদেছিলাম খুব। স্কুল যাওয়া, পড়াশোনা করা ফোবিয়া হয়ে উঠেছিল যে-ছেলেটার কাছে, ফেল করার পর কেন সে ওভাবে কেঁদেছিল, তা আজও অজানা আমার কাছে। এরপর থেকেই পরিবর্তন আসতে শুরু করে আমার মধ্যে। পড়াশোনার দিকে মন দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। বাড়িতে পড়াশোনার কোনো পরিবেশ ছিল না, সকাল-বিকালে সময়ও পেতাম না গোরু-ছাগল চরানো বা বাড়ির অন্যান্য কাজ করার ফলে। সন্ধ্যায় একটা টিউশনি পড়তে যেতাম। মিনিট কুড়ি হেঁটেই যেতে হত, সাইকেলও ছিল না আমাদের। ওই টিউশনিতে পড়া ছাড়াও, স্কুলের বন্ধুদের সাহায্য নিলাম। যারা পড়াশোনায় ভালো, ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়, তাদের বলতাম পড়া দেখিয়ে দিতে। আগে দুটো পিরিয়োডের মাঝের সময়টায় বা অফ ক্লাসে বাইরে বেরিয়ে পড়তাম, ফেল করার পর ওই সময়টা বই-খাতা নিয়ে বন্ধুদের কাছে গিয়ে বসতাম। ভালো ছেলেদের সঙ্গে সখ্য বাড়তে শেষ বেঞ্চ থেকে ফার্স্ট বেঞ্চে বসার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। সামনাসামনি বসায় স্যারদের পড়ানোও মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারি। বাড়ির কাছেই স্কুল হওয়াতে, স্কুল খুলতেই ফার্স্ট বেঞ্চে ব্যাগ রেখে দিয়ে চলে আসতাম সবার আগে। ওই সময়ে মনে মনে একটা রুটিন তৈরি করে নিয়েছিলাম সারাদিনের। সকাল ন-টা-সাড়ে ন-টা পর্যন্ত গোরু-ছাগলগুলোকে মাঠে খানিকটা খাইয়ে বেঁধে দিয়ে আসতাম। দশটায় স্কুল। টিফিনে বাড়ি এসে গোরু-ছাগলগুলোকে একটু সরিয়ে বেঁধে দিয়ে আবার স্কুল যাওয়া। বিকালে ফিরে মাঠে যাওয়া, সন্ধ্যায় পড়তে যাওয়া। সকালে স্কুলে যেতাম বেশিরভাগ দিন খুদসেদ্ধ বা বাসিভাত খেয়ে। টিফিনে বাড়ি আসতাম ভাত খাওয়ার আশা নিয়ে। কিন্তু ফিরে দেখতাম তখনও রান্না

কৃষিশ্রমিক আব্বার খুব কম পড়াশোনা করা ছেলেদের ভালো কোনো পেশায় যাওয়ার কথা নয়, যেতেও পারেননি কেউ। দর্জি, দিনমজুরি, রাজমিস্ত্রি, এম্ব্রয়ডারির কাজ করে জীবন কাটানো দাদাদের এক ভাই আপনাদের সামনে কথা বলার সুযোগ পেয়েছে চিকিৎসক-অধ্যাপক হওয়ার সুবাদে।

দারিদ্র্যের ছাপ লুকানো যায় না সহজে। আমাদের মা-ছেলের মুখে-চোখে সে-ছাপ তীব্র। আল-আমীন মিশনের সেক্রেটারি স্যারেরও সম্ভবত দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি শুনতে চাইলেন আমাদের কথা। আমরা কী বলব! এত দারিদ্র্য, এত অসহায়তার কথা সবটা কি বলা যায়? যতটা বলতে পেরেছিলাম সেক্রেটারি স্যারকে, তার থেকে বেশি কেঁদেছিলাম মা-ছেলে মিলে।

হয়নি। মুড়ি থাকলে একমুঠো খেয়ে আবার স্কুলে যেতাম। টিফিনে কিছু কিনে খাওয়ার স্বপ্ন দেখিনি ভুল করেও। পড়াশোনার খরচ জুগিয়েছেন মা হাঁস-মুরগি গোরু-ছাগল বেচে। একটু সুরাহা দিতে নিজেও সচেষ্ট থেকেছি। শুধু গোরু-ছাগল চরানো, জ্বালানি সংগ্রহ করাই নয়, অন্য কাজও করেছি। তখন সিক্স-সেভেনে পড়ি, কতই-বা বয়স হবে আমার, বছর বারো-তেরো, সেই সময় একবার সিমেন্টের লরি থেকে সিমেন্ট নামিয়েছিলাম। আমাদের বাড়ির কাছাকাছি একটা সিমেন্টের দোকানের মাল এসেছিল। সিমেন্টের বস্তাগুলো পঞ্চাশ কেজি ওজনের হয়, আপনারা জানেন, দশ-বারো বছরের ছেলেটা মাথায় সিমেন্টের বস্তা নিয়ে যখন গোডাউনে যাচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল ঘাড়টা বোধ হয় ভেঙে যাবে। দাঁতে দাঁত চেপে তবু তা বয়েছিল। সেই যন্ত্রণা আজও ঘাড়ে হাত রাখলে অনুভূত হয়। সিমেন্ট বওয়া হয়ে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ঘাড় ঘোরাতে পারিনি, মাথার চুলগুলো যেন আঠা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল কেউ— আজও ভাসছে সেই দৃশ্যটা। এভাবেই সরকারি মাটি কাটার কাজও করেছি সেই বাল্যকালেই। এসব কথা মনে এলেই মায়ের কথা মনে পড়ে শুধু। মা অভুক্ত থেকেই হয়তো খাওয়াতেন কোনো কোনো দিন। ইদে আমাদের একটা করে প্যান্ট-জামা হলেও, কাপড় মা সব সময় পেতেন না। আমরা দেখতাম মলিন কাপড় জড়িয়ে থাকা, অপুষ্ট শরীরে মা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খেটে চলেছেন শুধু। মা ছিলেন দৈনিক আঠারো ঘণ্টার শ্রমিক।

মায়ের মুখটা ভেসে উঠলেই মনে হত মা এত কষ্ট করে পড়াচ্ছেন, তাই আমাকে পড়তে হবে, এই ছিল আমার প্রেরণা। একটু একটু করে ক্লাসে ভালো রেজাল্ট করে এগোতে থাকি। ক্লাস নাইনে এসে আমি একটু ভালো টিউশন-স্যার পেলাম, যিনি সায়েন্সের বিষয়গুলো নিয়েই পড়েছেন, জানেন। ইতোমধ্যে আমি ক্লাসে প্রথম সাত-আট জনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছি। মাধ্যমিক দিলাম ২০০১ সালে। ৭০ শতাংশের মতো নম্বর পেয়েছিলাম। স্টার মার্কস পেয়েছিল একজনই। আমার ফল আশানুরূপ হয়নি। ভৌতবিজ্ঞানে লেটার পেয়েছিলাম। মাধ্যমিক পাস করার পর নতুন সমস্যা দেখা দিল। আমি পড়তাম মহারাজা নন্দকুমার উচ্চ বিদ্যালয়ে। আমাদের স্কুলে কলা বিভাগটা মোটামুটি ভালো হলেও বিজ্ঞান বিভাগ তত ভালো ছিল না। ফলে ভালো ছেলেরা, যারা বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে চাইত, অন্য স্কুলে গিয়ে ভর্তি হত। আমার বন্ধুদের অনেকেই বাইরে চলে গেল পড়তে। বাইরে গিয়ে পড়তে হলে যে-খরচখরচা লাগবে, তা জোগানোর সামর্থ্য আমাদের ছিল না। ফলে ওই স্কুলেই ভর্তি হলাম। সায়েন্স নিয়ে পড়তে গেলে একটা টিউশনে হবে না, কারণ, একজন স্যার সব বিষয় পড়ান না। আশেপাশে ভালো টিচারও ছিলেন না। আমাদের স্কুল থেকে বছর পাঁচেক আগে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছিলেন নরোত্তম আলিপাত্র। আর সঞ্জয় রায় নামে এক দাদা ছিল। দু-জনকে ধরলাম। এখন চাকরি করলেও দু-জনই তখন চাকরি পাননি। আমার অনুরোধে দু-জনে রাজি হলেন। খুব কম টাকায় পড়াতেন আমাকে। তাও সময়ে দিতে পারতাম না। কিছু বইপত্র জোগাড় করেছিলাম স্কুল থেকে আর কিছু কিনে। ওই সময় খেলাধুলা কমে গেল। নিজের কাজগুলো করে বাকি সময় পড়তাম। সেই সময় পারিবারিক একটা সমস্যা হল। আর্থিক অনটন তো ছিলই, তার সঙ্গে সেই সমস্যায় দিশেহারা হয়ে গেলাম। বাড়ির নিত্য অভাব-অনটনকে উপেক্ষা করে নিজের পাঠে মন বসানো কষ্টকর হল। পড়তে বসি কিন্তু কিছুই মনে রাখতে পারি না। শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে হাসপাতালে ডাক্তার দেখালাম। দীর্ঘদিন চিকিৎসা চলল। তখন বুঝতে পারিনি, পরে জেনেছি মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম। অবসাদগ্রস্ত অবস্থা কাটাতে ওষুধ খেতে খেতে ড্রাগ অ্যাডিকটেড হয়ে পড়েছিলাম। ওষুধ না খেলে সমস্যা বেড়ে যেত। এই অবস্থার সঙ্গে যুঝে ২০১০ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেলাম প্রায় ৬৫ শতাংশ নম্বর। সাত বছর পর আমাদের স্কুল থেকে সায়েন্সে ফার্স্ট ডিভিশন পেল কেউ। ভালো স্কুলের সাপেক্ষে এটা তেমন কোনো মার্কস নয়। এরপর দু-বছর আগের সমস্যা আবার ফিরে এল এবং এবার আর এগিয়ে যাওয়ার কোনো পথ রইল না। এবার কী করব, কোথায় যাব ভেবে পাচ্ছি না যখন, তখন আমার স্কুলের এক শিক্ষক জানালেন আল-আমীন মিশন নামে এক সংস্থার কথা, যারা পড়াশোনার বিষয়ে গরিব ছেলে-মেয়েদের সাহায্য করে। তিনি জানালেন, এ-বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে পারবেন পাঁচগ্রাম স্কুলের শিক্ষক মোয়াজ্জেম সাহেব, কারণ, ওঁর ছেলে ওই প্রতিষ্ঠানে পড়ে। আশার আলোকরেখার খোঁজে মোয়াজ্জেম সাহেবের কাছে গেলাম। উনি একটা চিঠি লিখে দিলেন, আর রুট ডিরেকশান দিলেন, কীভাবে যেতে হবে আল-আমীন মিশনে। হাওড়া জেলার খলতপুর কোথায় জানি না। এত দিন বাড়ি থেকে দীর্ঘতম দূরত্ব গেছি ৫০ কিমি, বহরমপুর। আমার মা, পড়াশোনা না-জানা মা, যিনি নিজের সংসার আর ছেলে-মেয়েদের মুখ ছাড়া দুনিয়ার মুখ দেখেননি, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আল-আমীন মিশনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে, অচেনা-অজানা রাস্তায় অনেক হয়রানি হয়ে যখন পৌঁছোলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আলো জ্বলে উঠেছে মিশন চত্বরে। এত আলো কোনোদিন দেখিনি আমরা। মনে হল, আমরা ঠিক জায়গায় এসেছি তো? মোয়াজ্জেম সাহেবের নির্দেশমতো আমরা প্রথমে তাঁর ছেলে সাখাওয়াতের সঙ্গে দেখা করে সব বললাম। তার আব্বার নির্দেশ মেনে মিশনের ভাইয়া বাপিরুলদার কাছে নিয়ে গেল সাখাওয়াত। মোয়াজ্জেম সাহেব একটা চিঠি বাপিরুলদাকে দিতে বলেছিলেন। আমরা সেই চিঠি বাপিরুলদাকে দিলাম। তিনি চিঠি পড়ে মিশনের সেক্রেটারি স্যারের কাছে নিয়ে গেলেন। সেক্রেটারি স্যারের নামটাও তখনও জানতাম না আমরা। গ্রাম্য আর দারিদ্র্যের ছাপ লুকানো যায় না সহজে। আমাদের মা-ছেলের মুখে-চোখে সে-ছাপ তীব্র। আল-আমীন মিশনের সেক্রেটারি এম নুরুল ইসলামেরও সম্ভবত দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি শুনতে চাইলেন আমাদের কথা। আমরা কী বলব! এত দারিদ্র্য, এত অসহায়তার কথা সবটা কী বলা যায়? আমাদের কথা যতটা বলতে পেরেছিলাম সেক্রেটারি স্যারকে, তার থেকে বেশি কেঁদেছিলাম মা-ছেলে মিলে। সেক্রেটারি স্যারের কথাটা আজও কানে বাজে, তিনি বলেছিলেন 'কী হেল্প করতে পারি বলো। এখানে তো উচ্চ-মাধ্যমিকের পর ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারিঙের কোচিং ছাড়া অন্য কিছু হয় না।' না বুঝেই স্যারকে বলেছিলাম ডাক্তারির কোচিং নেব। স্যার একটা টাকার কথাও বলেননি। বিনা পয়সায় শুধু ভর্তিই নেননি, বইয়ের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। সে-রাত্রে মিশনে কাটিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম পরের দিন। কয়েক দিন পর একটা টিনের ট্রাঙ্ক কিনে খুব সামান্য কয়েকটা জিনিস নিয়ে মিশনে এলাম। এবার একা।

এই আমার ক্ষুদ্র জীবন। জানি না একে সাফল্য অর্জন বলে কি না। সবে পেশাজীবন শুরু করেছি, ভবিষ্যতে হয়তো অনেক কিছুই অর্জন করব, সেই অর্জনের চেয়ে, জীবন কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এল, সেই ভাবনা বেশি ভাবাবে।

আসার দিন ফেলে আসা দিনের হাজার ছবি ভেসে উঠছিল মনে। লম্বা পথ এসেছিলাম আনমনা হয়ে। মন-খারাপ কোনো কথা বলতে দেয়নি আমায়।

আমি যেখান থেকে যেখানে এলাম, তাতে মিশন আমার কাছে স্বর্গ মনে হয়েছিল। স্কুলে যেমন কিছু ভালো বন্ধু পেয়েছিলাম, মিশনে সেই পরিবেশ ফিরে পেলাম। আমি যে-মার্কস পেয়েছিলাম, তাতে মিশনে সুযোগ পাওয়ার কথা না। মিশনের মেধাবী বন্ধুরা প্রচুর হেল্প করেছে আমাকে। মিশনের পড়ুয়াদের বন্ধুত্বপূর্ণ সহায়তা বড়ো সম্পদ। আমি আল-আমীন মিশনে দু-বছর ছিলাম। প্রতি সপ্তাহে বন্ধুদের বাবা-মারা দেখা করতে আসতেন। আমার বাড়ি থেকে কেউ আসতেন না। আসার উপায় ছিল না। আমি তখন অনেক বড়ো হয়েছি ঠিকই, তবু কখনো কখনো মন-খারাপ করত। কিন্তু কাউকে কিছু বলতাম না। মিশনে আমার তেমন কোনো খরচ ছিল না। বাড়তি কিছু কিনতাম না, সখ করেও না। বছরে একবার ইদে বাড়ি যেতাম। মিশন থেকে প্রথম বার জয়েন্ট দিয়ে কোনো র‍্যাঙ্ক হয়নি। তখন সিট অনেক কম ছিল, সুযোগ পাওয়া শক্ত ছিল। দ্বিতীয় বার দেওয়ার সুযোগ দিয়েছিল মিশন, কিন্তু দ্বিতীয় বারেও সফল হতে পারিনি। দু-বছরই জেনপার পরীক্ষায় পাস করেছিলাম। প্রথম বছর ভর্তি না হলেও দ্বিতীয় বার আর ঝুঁকি না নিয়ে সকলের পরামর্শ মেনে হোমিয়োপ্যাথিতে ডাক্তারি পড়তে ভর্তি হয়ে গেলাম। ডি এন দে হোমিয়োপ্যাথি মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে ভর্তি হই। ভর্তির সব টাকা দিয়েছিল আল-আমীন মিশনই। ২০০৫-'০৬ সালে ভর্তি হয়েছিলাম। ভর্তির টাকা ছাড়াও মিশন প্রতি মাসে ১৫৬০ টাকা করে স্কলারশিপ দিত। কিন্তু সেই টাকায় খরচা কুলাত না। মিশনকে বলতেও পারিনি। মনে হত, যা পাচ্ছি সেটাই তো অনেক। খরচ জোগাতে টিউশনি পড়াতে শুরু করলাম। সন্ধ্যায় বাড়ি গিয়ে কয়েক জনকে পড়াতাম। আমি কলেজের হস্টেলে থাকতাম না। কারণ, ব্রেক জার্নি করে কলেজ থেকে হস্টেল যেতে হয়। তাতে যাতায়াতের খরচ বেশি লাগে। হস্টেলের পরিবেশও ভালো না থাকায় কলেজের কাছে মেসে থাকতাম কয়েক জন মিলে। আমাদের কলেজ ছিল কলকাতার ট্যাংরা এলাকায়। এলাকাটা হিন্দুপ্রধান। টিউশনি পড়াতে গিয়ে নতুন এক ভারতকে আবিষ্কার করলাম। ভালো সচ্ছল পরিবার, যারা একটু বেশি পয়সা দেন, তেমন পরিবারে মুসলমান ছেলেরা পড়ানোর সুযোগ পান না। কারণ, টিউশনি পড়াতে গেলে মুসলমান ছেলেকে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে দিতে হয়, সেটা অনেকে চান না। ফলে যাঁরা কম পয়সা দেন, সেইসব বাড়িতে পড়ানোর সুযোগ পেলাম। এ-কথা অনেকে বিশ্বাস নাও করতে পারেন, কিন্তু বাস্তবে যেমন দেখেছি সেটাই বললাম। অবশ্য যেসব বাড়িতে পড়াতে যেতাম, তাঁরা যথেষ্ট সম্মানই করতেন। প্রতিদিন টিফিন পেতাম ছাত্র-ছাত্রীর বাড়ি থেকে। ১৫৬০ টাকায় মাসিক খরচের যে-হিসেব আমি করেছিলাম, সেখানে টিফিনের জন্য বরাদ্দ ধরতে পারিনি। মাঝেমধ্যে টিফিন পেতাম না। যাঁরা দিতেন না, তাঁরা তো আর জানতেন না যে, আমি টিফিন পাব সেই আশা নিয়ে টিফিন করে যাইনি। অনেক সন্ধ্যা না খেয়েই কেটে গেছে এই কারণে। এইভাবে পড়াশোনাই শুধু করিনি, অনেক দিন ছাড়া যখন বাড়ি যেতাম পাঁচ-সাতশো টাকা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে আসতাম। মিশন থেকে বছর দুই স্কলারশিপ পেয়েছিলাম। এরপর পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম থেকে ২০ হাজার টাকা স্কলারশিপ পেতে শুরু করি। বিত্ত নিগমের স্কলারশিপেই পড়াশোনা চালিয়ে নিই। এই সময় বোনের বিয়ে ঠিক হয়। ১০ হাজার টাকা বোনের বিয়েতে দেওয়ার জন্য ভোটের ফোটো তোলার একটা কাজ করি। সেখান থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা আর আড়াই হাজার টাকা ধার করে দিয়েছিলাম। যতদিন পড়াশোনার মধ্যে ছিলাম, বাড়তি খরচ করার মতো মন তৈরি হয়নি, সামর্থ্যও ছিল না। জীবনে প্রথম স্যু পরি ইন্টার্নশিপ শুরু করে। তার আগে পড়াশোনা করার পুরো সময়টা চঞ্চল পরেই কেটেছে আমার। বি.এইচ.এম.এস. শেষ হয় ২০১১ সালে। কোর্স শেষ হওয়ার আগে থেকেই এম.ডি. করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করি। এ-ব্যাপারে নবীন সিং নামে আন্দামান থেকে পড়তে আসা যে-দাদার সঙ্গে একই রুমে থাকতাম, তিনি বিরাট সাহায্য করেছিলেন। উনি তখন এম.ডি. করছিলেন আর কয়েক জনকে পড়াতেন। আমাকে শুধু পড়াতেনই না, নিজের পয়সায় খাওয়াতেনও। একটা জায়গাতে এম ডি এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কোচিং নিচ্ছিলাম। হাউসস্টাফ শেষ করার ৬ মাসের মাথায় স্টাইপেন্ড থেকে বাঁচিয়ে রাখা সব পয়সা শেষ হয়ে যায়। তখন ধার করা শুরু করি। চেম্বার করার কথাও ভাবতে শুরু করি। কিন্তু দাদারা তা হতে দেননি। তখন দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে গেছি। জীবনে সবথেকে বেশি পড়েছি এই সময়ে। ২০১৩ সালে এম.ডি. এন্ট্রান্সে থার্ড হলাম। কলেজ ও বিষয় নিজের পছন্দমতো নেওয়ার সুযোগ হল। ডি এন দে কলেজেই ভর্তি হলাম। বিষয় নিলাম হোমিয়োপ্যাথেটিক মেটিরিয়ামেডিকা। কী কী লক্ষণ দেখে কী ওষুধ দেব এটাই শেখানো হয় এই কোর্সে। হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসায় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এম.ডি. শেষ করলাম ২০১৬ সালে। রেজাল্ট পেলাম ১০ জানুয়ারি। ১৬ জানুয়ারি থেকে বীরভূম বিবেকানন্দ হোমিয়োপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে শিক্ষক হিসেবে পড়ানোর পাশাপাশি কয়েকটা জায়গায় চেম্বারও শুরু করি।

এই আমার ক্ষুদ্র জীবন। জানি না একে সাফল্য অর্জন বলে কি না। সবে পেশাজীবন শুরু করেছি, ভবিষ্যতে হয়তো অনেক কিছুই অর্জন করব, সেই অর্জনের চেয়ে, জীবন কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এল, সেই ভাবনা আমায় বেশি ভাবাবে। আপনাদের শুধু একটা কথা বলার, সবাই আমরা এ পি জে আব্দুল কালাম হতে পারব না, কিন্তু সানোয়ার সেখ হয়ে উঠতে পারে সানোয়ার সেখ। আমরা সবাই কিছু-না-কিছু হয়ে উঠতে পারি। আমি বিশ্বাস করি, জীবন কোনো মানুষকেই শূন্য হাতে ফেরায় না, প্রত্যেকের জন্যই কিছু-না-কিছু সুযোগ নিয়ে আসে। আমরা জানি না সে-সুযোগ কখন, কেমন করে আসবে। সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকবেন না, আসন্ন সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তৈরি রাখুন। আজকে আমার কথা শোনার পর আশা রাখব, একান্তে নিজেদের এই প্রশ্নটা করবেন— গোরু-ছাগল নিয়ে দিন কাটত যে-ছেলেটার, সে যদি ডাক্তার হয়, কলেজে পড়ায়, তাহলে আমি পারব না কেন? এই প্রশ্ন যদি আপনাদের মনে উদিত হয়, তবে সেটিই হবে আজকের এই বক্তব্য রাখার সার্থকতা। ভালো থাকুন আপনারা। সকলকে ধন্যবাদ।"

প্রেক্ষাগৃহের সব আলো জ্বলে উঠল। সানোয়ার সেখ দেখলেন হলভর্তি লোক উঠে দাঁড়িয়েছেন। কয়েক শো মানুষের করতালির শব্দ থামতে চাইছে না। কয়েক মুহূর্ত আনমনা হয়ে গেলেন সানোয়ার সেখ। চোখের কোণ কি চিকচিক করে উঠল? দূর হতে বোঝা গেল না। তিনি ধীর পায়ে মঞ্চ ছাড়লেন, ঠিক যেভাবে মঞ্চে এসেছিলেন।

(বাস্তবে সানোয়ার সেখ কোনো মঞ্চে বক্তব্য রাখেননি। কোনো মঞ্চে নিজের কথা বলতে উঠলে কীভাবে বলবেন, সেই ভাবনা নিয়েই সাজানো হয়েছে লেখাটি।) ■

কথায় আছে, গাঁয়ে আর মায়ে সমান। হুই যে দূরে সবুজ রেখা, ওই দিকেই গেছে রেললাইন, রাজ্য সড়ক, পঞ্চায়েতের রাস্তা। কোথাও-বা আলপথ। সব পথই গেছে কোনো-না-কোনো গাঁয়ে। কেননা, বাংলায় গ্রামই এখনও সংখ্যায় অধিক। আর বঙ্গদর্শনের ইচ্ছে হলে যেতে হবে ওইসব গ্রামদেশে।

প্রবাসের চিঠি, আত্মজাকে

চতুর্থ কিস্তি

অশোককুমার কুণ্ডু

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে ...

স্নেহের রিখি,

যাবে নাকি আমার সঙ্গে? মেঠো পথে। যেখানে জ্বলে ওঠে প্রদীপ, মৃদু শিখা বাতাসের ভয়ে কম্পমান। তোমাদের নগরের আলোকিত শীৎকার, অট্টহাসি নয়। নাহ্। উপমাটা একটু চড়া হল। তুমি অভিমান করবে। নগরের আলোর উৎসব, সেও সুন্দর। তবে তার সুর বড্ড চড়া, বিজ্ঞাপিত। এ-সময়টা আমি পালাই নগর ছেড়ে জোনাকজ্বলা গাছের ছায়ান্ধকারে। এখানে গেঁয়ো গাঁওয়ার আদমিদের বসতভিটেতে আলো এবং অন্ধকারের সমান্তরাল অস্তিত্বের আয়োজনে নিজের জন্মভিটে খুঁজি, কাঙালের মতন। সে-আলো বিনত, সজ্জন। বাজি-বোমা-ঘুরনচরকি, উড়ন্ত ফুলকির মতন অহংকারী নয়। তুমি যাবে কি আমার পথে, রিখিয়া? হয়তো নাগরিক ব্যস্ততায় সময় পাবে না। তোমাদের অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব, তোমাদের সময় বড্ড কম। তোমরা উড়ন্ত তুবড়ির মতন ব্যস্ত ঘূর্ণনের মাঝে বলবে, "কাজ না করলে সময় নষ্ট।" তা ঠিক। আমি কই কী— "কাজ করলে সময় এবং কাজ দুটোই নষ্ট।" লিখেছিলেন রসিক, আলোকিত এক বৈঠকিপ্রাণ সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব, তাঁর গুরুদেবের কাজকর্ম ও আড্ডা প্রসঙ্গে। হ্যাঁ, তুমি ধরতে পেরেছ নিশ্চয় 'গুরুদেব'?— রবীন্দ্রনাথ। আমি যাঁকে প্রাজ্ঞ, প্রণম্যজ্ঞানে 'খোয়াইবুড়ো' বলে থাকি।

আলো। ওই আলো। 'কালো রাতি গেল ঘুচে / আলো তারে দিল মুছে।'

ওই আলো। দীপশিখার জ্বলাও আলো। শবে বরাতের আলোরে সালাম করি। ওহে মুর্শিদ, পয়লা দানে সে-কথা কবুল করি। সোলস ডের আলো। আলো-আঁধারের গর্ভে জন্ম নেয়। মুক্তির আলোয় সে ভূমিষ্ট হয়। আলোর কি ছাই কোনো জাত আছে? আলো মুক্তিজাত। সে নিজেই নিজেকে জন্ম দেয়। অন্তিমে, নিজেই ডেকে নেয় আপন মৃত্যুকে।

এত ভ্যাজোর-ভ্যাজোরে দরকার কী। চলো ত্বরা করি। আলোকের পূর্ণ কলস তুলে নিই কোলে-কাঁখে, কাঁধে অথবা রাখি মাথার 'পরে। তবে হ্যাঁ, পূর্ণতার ভারে মাথা থেকে গড়িয়ে পড়তে পারে মৃত্তিকাকলসখানি। তাহলে কলস চৌপাট চুরমার হবে। তখন ছড়িয়ে পড়া, দুর্বল বিন্দু বিন্দু আলোককণাদের গিলে ফেলবে অন্ধকার। সে- সময় শ্মশানের বেম্বদৈত্যরা নৃত্যে নৃত্যে রচনা করবে ভয়।

বেরিয়ে পড়া যাক। যাব আর কত দূর? বেশি দূর না। আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার। রাতের ট্রেন। হাসছ তুমি রিয়া? লোকে যায় হিল্লি-দিল্লি, মথুরা-বৃন্দাবন নিদেন বাঙালির প্রিয় মুড়ি এবং পুরী। তবুও তো পাড়া-পড়শিদের বলা যায়। এ কী লজ্জার! ভ্রমণে কোথায়, না পুরুল্যে। অবশ্য করপোরেটের টুরিজমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেকোনো জায়গায় উড়ে গিয়ে জুড়ে বসা যায়। কিন্তু এ কেমন ভ্রমণ? আমার ভ্রামণিক মন গরিব, দরিদ্র নয়। কাউকে ভ্রমণের পাঁচ কথা কইতে না পারলে নিজের ঘরে বসে নিজেকেই বলব। কথক আমি শ্রোতাও আমি। টেহার জোর নেই বাওয়া। তাই বলে ভ্রমণে যাব না? কত সামান্য পুঁজিতে কত কিছু বুক ভরে দেখা যায়।

খিয়া মা আমার, আমার দর্শনাদর্শে তুমি পা না-মেলালেও আমি দুঃখ পাব না। আমি একা, একলা চলো রে। কবির মনের কথায়, হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান। তোমাকে এই চিঠি পৌঁছে দেব তোমার গৃহে। চিঠিতে থাকবে বঙ্গোর বারতা, হেমন্তের শিশিরবিন্দু ও সপ্তপর্ণী, এখন ছাতিম ফুলের সুঘ্রাণ। সপ্তাকাশ থেকে নেমে আসে সে-আত্মারা, ভিটেতে জ্বালানো চিরাগের পথ দেখে। বলব তাদের কথা। গরিব অথচ ধনী কৃষককুল কেমন করে তাদের জীবনের গান গেয়ে শোনায় তাদেরই গৃহপালিত গোরুদের। আচ্ছা, গোরুরা কি মানুষের গান বোঝে? কিছু কিছু ভাষা ও নির্দেশ বোঝে? আমি আমার কৃষিবন্দিত ও রাখালিয়া জীবনে দেখেছি, তারা বোঝে। এই কথা-সুর-বর্ণনার অভিজ্ঞতা সাজিয়ে তোমায় পাঠাচ্ছি রিখিয়া। বলো তো মেইলে বা হোয়াটস অ্যাপে বা ফেসবুকেও পাঠাতে পারি। চিঠির হার্ড কপি তোমাদের এ-যুগে বাতিল, নাপাক প্রায়। এ-যুগ ভারচুয়াল রিয়ালিটিতে মজেছে। আমি ছুঁতে চাই, পরশ পেতে চাই, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের স্পর্শে মজে যেতে চাই। তোমরা থাকো তোমাদের স্যাটেলাইটে।

তোমরা নবীন, এ উদাস
বিষাদ কি তোমাদেরও চেনা?
স্মৃতি হানে আদি মহীদাস,
ভূমিদাস স্মৃতির যন্ত্রণা
আমাদের চৈতন্যে আকাশ।

— *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ*, বিষ্ণু দে

আমি উত্তরে থাকি মৌন। উত্তুরে বাতাসের পদধ্বনি। মৃদু শব্দে শীত-শীত ভাব ভাসছে বাতাসে।

রাম পেয়ারির চায়ে। গাড়ি ঢুকল ভোরে আদ্রায়। ফিকে বাতাসে কুয়াশার সমাগম। শীতের সংকটময় পদধ্বনি হেমন্তে। রাম পেয়ারির চায়ে রাম পেয়রি ...। বলা ছিল নীচের বাঙ্কের সহযাত্রীকে, ভাইয়া আদ্রায় ট্রেন এলে আমায় দয়া করে ডেকে দেবেন। হাওড়া ইস্টিশনে গাড়িতে ওঠার পরেই কাতর অনুরোধ শীতকাতুরে আমির।

— আরে ঘাবড়াচ্ছেন কেন দাদা? রাম পেয়ারিই আপনাকে ডেকে দেবে। সকলকেই ডেকে দেয়। তা না হলে ওর চা বিক্রি হবে কেমন করে?

— তবে তো কোনো ভাবনা নেই। আপনার কাছে সরষের তেল আছে?

— কেন, কেন? কী করবেন?

— সরষের তেল পেলে, দু-নাকে দু-ফোঁটা পুরে দিয়ে, নিশ্চিন্তিপুরে ঘুমাতাম।

— "দাদা তো বেশ রসিক বটে।" এক যাত্রী বললেন।

তিন তিন ছয়, ওপর-নীচের বাঙ্ক। যাত্রাটা জমে গেছে। কেননা, নীচে ছ-জনা বসে গেঁজাচ্ছি। এক যাত্রী কইলেন, "আদ্রায় অনেকক্ষণ দাঁড়াবে ট্রেন।"

তাই তো জানি। আদ্রা জংশনে ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। কারণ, তার মাথা কেটে এঞ্জিনসহ চলে যাবে বোকারো। মাঝে পড়বে ভজুড়ি-মহুয়া এবং চন্দ্রপুরা স্টেশন। ল্যাজাটায় নতুন এঞ্জিন জুড়ে চলে যাবে পুরুলিয়া জং হয়ে নিমড়ি হয়ে চক্রধরপুর। মাঝে অনেকগুলো স্টেশন।

নিমড়িতে আমার প্রিয়তম গান্ধী লোকসেবায়তন। জীবনের অনেক সুহানা সফর এই গান্ধী আশ্রমকে ঘিরে। তার আগে পশ্চিমবাংলার প্রান্তিক স্টেশন বিরামড়ি। তারপরেই তো বিহার শুরু। ভুল হল টুকু। বর্তমানে ঝাড়খণ্ড।

আড্ডা বিস্ময়ে বলে ওঠে, "দাদা তো দেখি অনেক খবরই রাখেন। রিপোর্টার নাকি?"

— আমি? রিপোর্টার হওয়ার যোগ্যতাই নেই। গ্রামগঞ্জে ঘুরে থাকি। এই আর কী। শুয়ে পড়া যাক। রাত হয়েছে। খড়গপুর এল বলে।

রাম পেয়ারির চা। রাম পেয়ারির চা। সকালে দু-পাত্তর চা লাগে আমার। গেটের বাইরে সাতসকালে সুভাষ রায়, শিক্ষক, দাঁড়িয়ে আছেন চালকসহ

বাইক নিয়ে। আমি বাঙালি, দুর্বল মেরুদণ্ড ও হাঁটুর ব্যথায় কাবু। আমি অটোতে উঠি। আদ্রা টু চেলিয়ামা, কুড়ি-বাইশ কিলোমিটার। ওরা দু-জন অটোর আগে আগে, যেন পাইলট কার। দু-তিন দিন আগে হঠাৎ করেই এ-অঞ্চলে পাথর পড়ে আকাশ ভেঙে। পাথর! আসলে শিলাবৃষ্টিকে মানভূমি ভাষায় পাথর বলে। তাই হঠাৎ ঠান্ডা পড়েছে। যেন পৌষ-মাঘের জাড়। চেলিয়ামায় সুভাষের বাড়িতে চান-ভাত করে পথের ধারে সুভাষের হাতে গড়া আশ্রম মানভূমি লোকসংস্কৃতি পরিষদে ছাউনি পাতব। লটর-বটর রেখে ঘুরব মুল্লুক। চিন্তা নেই কালীপদ রাঁধবে। ধনু সাঁঝের আলোয় ঝুমুর গাইবে। শান্তিরাম দমে খাওয়াবে গেঁড়ি-গুগলি থেকে শালুক শাক।

খিয়া তুমি বিরক্তি-ঘেন্নায় ছিঃ ছিঃ করছ। ভাবছ এ কেমন বাপ তোমার। তুমি যদি ফরাসি দেশে যাও তো সেরা নন-ভেজের একটি পদ পাবে। নাম ভুলেছি তার। অত্যন্ত দামি পদ। একসময় চার-পাঁচ তারকাখচিত হোটেলে তাক লাগানো খাবার। পিতলের পাত্রে বড়ো বড়ো চারটি খোসাসহ সেদ্ধ ঝিনুক। ফোটা শালুকের মতন হাঁ করে কদমবুশি। তাতে মরিচ-লবণের ডাস্ট ছড়িয়ে, চামচ দিয়ে তুলে খাওয়া। এক জোড়ার দাম হয়তো আমার সারাবছরের রোজগার। দেখছি, যত দিন যাচ্ছে হাইব্রিডের পয়জন প্রোডাক্ট ছেড়ে বড়োলোক সম্প্রদায় বায়ো-সভ্যতায়। নিজেরা বিষ বেচে বিষক্রিয়া করে আপাতত নিরাপদের বৈঠকখানা খুঁজছে। এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ। জনপদে আগুন লাগলে দেবালয় তো বাঁচে না মাগো।

আশ্রমের সপ্তপর্ণী, দুটি ছাতিম গাছ ফুল ঝরিয়ে সুগন্ধে ভরিয়ে দিচ্ছে বাতাস। প্রকৃতি এক পরমাশ্চর্য নারী। আমি প্রণত, প্রার্থনা করি তাঁর কাছে, নিত্যদিন শুদ্ধ আরাধনার। সবই তিনি দেন, দু-হাত ভরে অকৃপণ দান। কৃশ দুটি ছাতিম গাছের ফুলের পাতার এত জোর। সুগন্ধ, তবে একটু চড়া ঘ্রাণ। গাছের তলা থেকে কুড়িয়ে নিই ছোটো ছোটো শুভ্র পুষ্পগুলি। আশ্রমের শ্রমিক, পড়শি গ্রামের এক নারী গাছকাপড় পরে মাটি কোপায়, জল তোলে, গাছের পরিচর্যা করে। সংসারে দুটি বাচ্চা। বড়োটা ছোটোটাকে সামলায়। ছোটোটা বড়োটাকে। সকালে তিন জনে পান্তা পেটে পুরে, সন্ধ্যা চলে আসে আশ্রমে। আটটায় শান্তিরাম-ধনু-কালীপদ-সন্ধ্যা— ওরা কাজ করে। তবে আশ্রমে ডেইলি তো কাজ জোটে না। আমি একমুঠ ছাতিম ফুল কুড়িয়ে সাজাই একটি একটি, লিখি সপ্তপর্ণী। ফুল দিয়ে লিখি।

— দাদা, আপনি ছাতিম ফুল বড়ো ভালোবাসেন বুঝি?

নীরবে সন্ধ্যার মুখের দিকে, নাকের পাটা দেখে চমকে উঠি।

— তুমি বুঝি ছাতিম ফুলের গড়নে নাকছাবি বানিয়েছ। বাহ্। সুন্দর বটে।

ক্লান্ত সন্ধ্যার মুখে মৃদু হাসি।

— গরিবের আবার গয়না। সোনা তো নয়। রুপো।

— তা হোক। তবুও সুন্দর।

— দাদা, তোমার মেয়েকে একবার আশ্রমে এনো। কবে বিহা হইয়ে চলে যাবে পরের ঘরে। আনলে বেশ হবে। আমি উহাকে আমার গ্রাম

এ-সময়টা আমি পালাই নগর ছেড়ে জোনাকজ্বলা গাছের ছায়ান্ধকারে। এখানে গেঁয়ো গাঁওয়ার আদমিদের বসতভিটেতে আলো এবং অন্ধকারের সমান্তরাল অস্তিত্বের আয়োজনে নিজের জন্মভিটে খুঁজি, কাঙালের মতন।

ঘুরাইয়ে দেখাব। এখেনে কত বড়ো বড়ো মন্দির, দিঘি। কুনোই অসুবিধা হবে না।

— আচ্ছা, একবার আনতে হবে। বলব বিটি ছাওয়ালটাকে। মানবে কি আমার কথা?

হায় রে হায়। সপ্তপর্ণী পাতার পত্রবিন্যাস। তার ফুলের ডিজাইনে ছাতিম-নাকছাবি। পরবে নাকি রিখিয়া? সুন্দর দেখাবে কিন্তু। হচপচ হরিদাসের গুলগুলি-ভাজা নয়। আমি শোনাব তোমায় আমার যৌবনের শোনা ধূসর সংগীতলিপি, 'হলুদ বনে বনে / আমার নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে।' তোমার ভালো লাগলেও লাগতে পারে। ফেডেড জিনস। এক পায়ে নূপুর। হাই হিল। লো-কাট টপ। বারে বারে টেনে টেনে কোমর ঢাকার চেষ্টা এবং এলোচুলে, গর্জন তেল মাখা মুখমণ্ডল, বাম নাকে ছাতিম ফুল। জানি তুমি আসবে না। তবুও সন্ধ্যা আসন পেতে রেখেছে তোমার। তোমার পায়ের শব্দের প্রতীক্ষায় আদ্রা টু চেলিয়ামা, আমি জেগে থাকব।

তুমি তো জান না, আমার খোয়াইবুড়ো শান্তির নিকেতনে পাঠান্তে, ক্লাসে পাসের পরে যে-অনুষ্ঠান হত, তাতে প্রতি পড়ুয়ার হাতে একটি করে সপ্তপর্ণীর পাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সপ্তপর্ণীর পত্রবিন্যাস তুমি যদি দেখ রিখি তবে মুগ্ধবিস্ময়ে তোমার ভ্রূযুগল হবে ধনুকের জ্যা। আর পাতাগুলি একটিই বিন্দু থেকে উদ্ভাসিত। সজ্জন, সুজন— এক বিন্দুতে সাতজন। আমাদের সংসারগুলি একপত্রী, ভয়ংকর ও অভিশপ্ত। অবশ্য কোনো কোনো ছাতিমের ডালে সাতটার বদলে ছ-টির দেখাও মেলে। তবে তা খুব কম। প্রকৃতির পাঠ আমরা অনেকটাই নিতে অপরাগ এখনও।

ওহিরে ও বাপু রে
জাড়ে তোর কাঁথা নাই
বরষায় নাই জুতা
বাপ রে পরবে না পারি দিতে পিঠা
বাবু হো
মাড়টুক খাইয়ে লিয়ে
তুই কাঁদিস ভোখায় রে
বাবু হে

টেরা কালিন্দী খালিগলায় গোহালের গৃহপালিত গোরুদের গান শুনিয়ে, দুখজাগানিয়া গান শুনিয়ে, জাগিয়ে রাখতে চায় বাঁদনা পরবে। আসলে প্রান্তিক এই নিম্নবর্গীয় কৃষক নিজেরই বঞ্চনা, শোকের কথা গায়। গোরুদের শোনায়। কোনো বাদ্যযন্ত্র জগঝম্প নেই। এ-বিষাদ কি তোমার ভালো লাগবে খিয়া? তোমরা তো দুধে ঘোলে ঘৃতে পরমানন্দে। দেশ রাষ্ট্র নেতা যখন নিম্নবর্গের বিষাদগাথা শোনে না, তখন গৃহপালিত প্রাণীকেই শোনায়। সে যে তার নিত্যসঙ্গী। দীপাবলির আলোয় যখন রোদঝলমল রাত তোমাদের, তখন লণ্ঠনের আলোতে এদের গান শুনে বুঝতে পারি

মল্লভূম-সিংভূম-মানভূমের এই মাটির গানে আমি মজি। দীপাবলির সলিড আঁধার চৌচির করে ধেয়ে আসে অহিরার গানে ‘কপিলামঙ্গাল’। স্বর্গ থেকে অভিশপ্ত, শিবের কন্যাসমা কপিলাকে দেবতারা পাঠালেন এই দুঃখতাপিত পল্লিভূমে।

নগরের শোষক ও শাসকসমাজকে।

মল্লভূম-সিংভূম-মানভূমের এই মাটির গানে আমি মজি। দীপাবলির সলিড আঁধার চৌচির করে ধেয়ে আসে অহিরার গানে ‘কপিলামঙ্গাল’। স্বর্গ থেকে অভিশপ্ত, শিবের কন্যাসমা কপিলাকে দেবতারা পাঠালেন এই দুঃখতাপিত পল্লিভূমে। কপিলা স্বর্গসুখ ছেড়ে আসতে চায়নি। দেবতাদের কড়া সিদ্ধান্ত, মর্তে গিয়ে দুধ দাও। ঘি হবে। ননি হবে। তাই খেয়ে পুষ্ট হবে দরিদ্র মর্তবাসী। কল্পতরুর ছায়াতলবাসী কপিলা স্বর্গ থেকে এল এই ধরাতলে। শিবঠাকুর কথা দিয়েছিলেন, দীপাবলির আলোয় পথ চিনে এখানে এসে দেখে যাবেন কপিলার সুখ-দুঃখ। অত্যাচার হলে শিব স্বপ্নে কৃষকদের শাস্তি দেবেন। দিনের বেলায়, মূর্খ গোরুরা বিয়ের দিনে পরস্পরের লতাপাতার মালা খেয়ে ফেলত। শিশু আমির ধমক তারা মানতই না। প্রতিপদে, দীপাবলির অমাবস্যা কাটলেই গোরুদের সাজানো হয়। পায়ের খুরে জল দিয়ে পরে তেল মাখায়। শিঙে তেল দেয়। গাভী হলে কপালে সিঁদুর পরায়। বরণডালায় থাকে বিয়ের সব উপচার। বর্ধমানের গ্রামে একে বলে গোদ্বিতীয়া। এ-দিনই কিন্তু ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। ভাইফোঁটা। খিয়া তোমার তো আপন ভাই নেই। সে-বার তুমি যে গেলে তোমার মামার ছেলেকে ফোঁটা দিতে। ওই হল ভাতৃদ্বিতীয়া। অখণ্ড, খণ্ড বঙ্গেও এ এক অপূর্ব বাঙালির সমৃদ্ধ লোকাচার। করপোরেট একে মুছতে পারেনি আজও।

আমার মাতৃগ্রামেও গোরুর বিয়ের বরযাত্রী হয়েছি কত কত বার। আমার পিতৃগ্রামের এই গোরুর বিয়েতে জোগাড়ে হয়েছি কতবার মায়ের সঙ্গে। বনমালীলতা তুলে এনে মায়ের হাতে দিয়েছি। মা পাকিয়ে মালা করে পরিয়েছে গোরুর গলে। আমার দুর্ভাগ্য তোমায় দেখাতে পারলাম না এই গ্রামীক, মূল্যবান লোকায়ত চালচিত্রের দর্শন। শোষক সাহেবরা ব্যঙ্গ করে। আমাদের গোপূজক, নাগপূজক বলে ব্যঙ্গ করে। থাক সে-কথা। যাক সে-কথা। সাহেবের কেচ্ছা, শোষণ শোনাতে হলে একখণ্ড ইলিয়ড-ওডিসি লিখতে হয়। তাদের জীবন সংসারের চুটকিলা লিখতে হলে দশ ফর্মার রয়েল সাইজ কিতাব লিখতে হয়, ষোলো পৃষ্ঠার ফর্মা ধরে।

অহিরে, কতই-বা কইব তোকে দুখের কহানি
মর্মে যতেক রাহাজানি
মজিল মানব যত আপন সুখে
ওহে ওহিরে, বাবু হো ...

‘কপিলামঙ্গালে’র কাহিনি, পুথি সব খুঁজে সংগ্রহ করছেন গ্রামীণ বাঁকুড়ার ভূমিপুত্র অধ্যাপক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। একটি কৃশ গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। অপূর্ব। এই নিয়ে। পরিশ্রমী অধ্যাপকের অন্বেষণে আমার রইল শুভেচ্ছার পাঁচালি।

জান তো রিখিয়া, কুমারী-এয়োতিরা ভাইফোঁটার জন্য চন্দন ঘষত শিশিরের নির্মল জলে। সে-জলকণিকায় সূর্যসহ তাবৎ ব্রহ্মাণ্ডের ছায়া পড়ে। খুউব ভোরে মেয়েরা ঘুম জেগে ঘাসের ডগায় রাতের জমা শিশিরবিন্দু সংগ্রহ করে নিত মৃৎপাত্রের বাটিতে। ওই জলে চন্দন বাটা শেষ হলে, ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের অমরতা প্রার্থনা করত। দূরপ্রবাসী ভাইয়ের জন্যও ঘরের চৌকাঠে মাঙ্গালিক ফোঁটা দিয়ে বাতাসে বার্তা পাঠাত। আমি গোপনে বিধবা নারীকে প্রয়াত ভাই-দাদার মঙ্গাল কামনা করতে দেখেছি এই ব্রতে। আত্মার জন্যও মঙ্গালপ্রার্থনা লাগে। বাহ্ রে, বাহ্! নমি এই লোকাচার, লোকব্রতকে। তুমি একবার গেছিলে আমার এক ভগ্নী পূরবী দাস খাঁর বাড়িতে। ওর স্বামী, আমার ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু, অধ্যাপক লতিব খানের অনুমতি নিয়ে ভিন্ন এক লোকায়ত বার্তা পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছি হেমন্তের আকাশে। পূর্বী ওরফে বনু আমাকে ভাইফোঁটা দেয় কত্তার সামনে ওর বাপের বাটীতে।

আশ্বিন-শেষের দিন থেকে কার্তিকভর দীপ জ্বালানো বাঙালি হিন্দুলোকাচার। ওই আলো। সেই আলো। যে-আলোর কথা ছিল সূচনায়। চৌকো, হেক্সাগোনাল, অথবা ত্রিভুজের খাঁচা। সাদা কাপড়ে বা রঙিন কাপড় বা কাগজে চারদিক মোড়া। ভিতরে জ্বলবে মাটির প্রদীপ। তা কাদার তালের ওপর বসিয়ে দিতে হয়। কেন? বারে! প্রদীপ হঠাৎ উলটে গিয়ে কাগজ-কাপড়ের খাঁচায় আগুন ধরে যাবে। বহু উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে ঘরে আগুন লাগবে যে।

অনেক উঁচুতে ওটি বাঁশের মাথায় বাঁধা হয়। বাঁশ পোঁতা থাকে মাটিতে। বাঁশের গায়ে আংটা পুঁতে কপিকলের মতন ওই আলোকিত খাঁচা তোলা হয়। খুউব কৈশোরে তোমার ঠাকুমা, আমার মাকে শুধিয়েছিলাম, “মা, ওই আলো কোথায় যায়?” উত্তরটা সমগ্র জীবন বুকে ধরে আছি। ওই আলো যায় আকাশে, যেখানে প্রয়াত আত্মজনেরা তারা হয়ে জ্বলে আছেন। তাঁরা ওই আলো দেখে তাঁদের ছেড়ে যাওয়া ভিটেতে ফিরে আসেন। প্রতি রাতে এসে দেখে যান তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা দুধেভাতে আছে তো? আমি কতবার মাকে বায়না করেছি, আমার ঠাকুরদাদাকে দেখাতে। মা শুধু বারে বারে বলেছিল, তুমি ভালো ছেলে হও। ভালো পাস দাও। তবেই তাঁরা দেখা দেবেন।

মাথার ওপরে যে-সপ্তাকাশ আছে। ভালো-মন্দের কর্মগুণে মানুষের আত্মার বাস আকাশের বিভিন্ন স্তরে। এই সপ্তাকাশের ধারণা ইসলামেও আছে। তুমি এর সমাজতাত্ত্বিক ভাব খুঁজে আমায় দিয়ো। আমি যে তোমার মতন সোসাল সায়েন্সের পাঠ পাইনি। এ নিয়ে তুমি কাছে এলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দেবযান’ গ্রন্থটি দেব। পড়বে তুমি। রাত ভোর হয়ে এল। এবার ঘুমিয়ে পড়ি আমি। ■

প্রতি বছর মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক-সহ নানা পরীক্ষা হয়। ফল বেরোলে সংবাদপত্রে নাম ওঠে কোনো কোনো ছাত্র-ছাত্রীর। গর্বিত হন বাবা-মা। গৌরব বাড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও। কিন্তু, র‍্যাঙ্ক করা ছাত্র-ছাত্রীর সাফল্যের পেছনে কী রসায়ন কাজ করে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই-বা কী ভূমিকা? এই সংখ্যায় বলছে ২০১৭ সালের নিট মেডিকেলে আল-আমীন মিশনের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী

আশিফ ইকবাল হোসেন

মধ্যমেধার পড়ুয়াও এখানে ভালো ফল করে

ঠিক ছিল সন্ধ্যার আগে পৌঁছে ইফতার করে তারপর বসব 'শিখরদেশে'র লেখার জন্য সাক্ষাৎকার নিতে। বসা হবে আল-আমীন মিশনের কলকাতার ইলিয়ট রোডের অফিসে। আশিফ ইকবাল হোসেন আমার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। প্রায় জনা কুড়ি একসঙ্গে ইফতার করা হল। একটা ছোটোখাটো ইফতার পার্টিই বলা যায়। ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে মুখোমুখি বসা গেল আল-আমীন মিশনের মধ্যে ২০১৭ সালের নিট মেডিকেলে প্রথম স্থানাধিকারী আশিফ ইকবাল হোসেনের সঙ্গে।

- আশিফ, তোমাদের বাড়ি কোথায়?
- আমাদের বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার গোপালপুর গ্রামে।
- আর্থসামাজিক দিক থেকে তোমাদের গ্রামের অবস্থা কীরকম?
- আমাদের ওখানে পড়াশোনার হার খুব একটা ভালো না। ছেলেরা বেশিরভাগই হাই স্কুলের পড়া শেষ না করেই কাজে লেগে যায়। মেয়েদের মধ্যে পড়াশোনার হার বাড়ছে। কিছু পরিবার ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন মিশনে পড়াচ্ছে এখন। চাষবাস হল প্রধান জীবিকা। অনেকে রাজমিস্ত্রির কাজে ভিন রাজ্যে চলে যায়। এলাকার মেয়েদের অনেকেই বিড়ি বাঁধে।
- তোমার আব্বা কী করেন?
- আব্বা বি.এসসি. পাস, শিক্ষকতা করতেন।
- করতেন মানে— এখন করেন না, অবসর নিয়েছেন?
- না, অবসর নেননি। বয়স সবে ৪৭ বছর। অসুস্থ হয়ে বাড়িতেই থাকেন।

- কী হয়েছে আব্বার?
- প্যারালাইজড হয়ে শয্যাগত।
- কোথায় শিক্ষকতা করতেন তিনি?
- আমাদের পাশের গ্রাম গোলাপগঞ্জের জে বি এস হাই মাদ্রাসায়।
- বেতন পান তো?
- না, এখন আর পান না। সমস্ত ছুটি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই হাজিরা না দিতে পারায় বেতন পাচ্ছেন না।
- তাহলে এখন চলে কী করে?
- মা আইসিডিএস কর্মী। মায়ের সামান্য বেতনেই চলছে।
- বাড়িতে আর কে কে আছেন?
- আমার পরে ছোটো দুটো বোন। বড়োটা বি.এসসি. নার্সিং প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ছোটো বোন ক্লাস টেনে পড়ে।
- তোমার পড়াশোনা কীভাবে এগিয়েছে?
- আমি প্রাথমিক স্তরে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছি স্যামুয়েল মডার্ন ইনসটিটিউট নামে একটা বেসরকারি স্কুলে। তারপর ভর্তি হই আল-আমীন মিশনে। আমি যখন ভর্তি হই মিশনে, সেই সময় আল-আমীন মিশনের বেলপুকুর শাখার ছাত্র আরিফ সেখ মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছিল। আমাকে তাই বেলপুকুর শাখাতেই ভর্তি করেছিলেন আব্বা। বেলপুকুরে আমি ফাইভ-সিক্স পড়েছি, তারপর চলে আসি ধুলিয়ান শাখায়।
- ধুলিয়ান শাখায় কেন চলে এলে?
- আমার বড়ো বোনকে ধুলিয়ান শাখার গার্লস ক্যাম্পাসে ভর্তি করা হয়েছিল। দু-ভাইবোন এক-কাছে থাকলে যাতায়াতের সুবিধা হবে, সেই ভেবে ধুলিয়ানে ভর্তি করা হয়। ধুলিয়ানে দু-বছর ছিলাম, তারপর বাড়ির কাছাকাছি একটা স্কুলে চলে আসি।
- কেন চলে এলে?
- হঠাৎ করে আমার রেজাল্ট খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি মিশনে কোনোদিন ফার্স্ট হতাম না। সেকেন্ড-থার্ড হয়েছি। কিন্তু ক্লাস এইটের ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষায় সেভেন্থ র‍্যাঙ্ক হয়ে যায়। তখন মনে হতে শুরু করে যে আরও খারাপ হয়ে যাবে। তাই মন বসাতে পারছিলাম না পড়াশোনায়। তাই চলে আসি।
- ফিরে এসে কোথায় ভর্তি হলে?
- আমাদের বাড়ির কাছেই তৈরি হয়েছে টার্গেট পয়েন্ট স্কুল। আল-আমীন মিশনকে অনুসরণ করে অনেক মিশন তৈরি হয়েছে। টার্গেট পয়েন্ট সেরকমই একটা মিশন। টার্গেট পয়েন্ট থেকেই আমি মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিই।
- কেমন রেজাল্ট হয়েছিল?
- আমি ২০১৪ সালে মাধ্যমিক দিয়ে পেয়েছিলাম ৯৪.৭ শতাংশ নম্বর। উচ্চ-মাধ্যমিকে পেয়েছিলাম ৯৪.২ শতাংশ নম্বর। এরপর জয়েন্টের কোচিং নিতে আবার আল-আমীন মিশনে ভর্তি হই।
- আল-আমীনের কোন শাখা থেকে জয়েন্ট কোচিং নিয়েছিলে?
- আমি হাওড়ার নয়াবাজ শাখায় কোচিং নিয়েছি।
- ওদিকে চার বছর আর কোচিং এক বছর— মোট পাঁচ বছর পড়েছ আল-আমীন মিশনে। কোনো ছাড় পেয়েছিলে?
- আব্বা-মা চাকরি করেন। আব্বা অসুস্থ হন জয়েন্ট কোচিং নিতে আসার কয়েক মাস পর। ওদিকে আমরা ফুলপেয়ি হিসেবে পড়েছি। জয়েন্ট কোচিঙে কিছু ছাড় পেয়েছি। আব্বার অসুস্থতা আর চিকিৎসার খরচের কথা বিবেচনা করে কনসেশন করেছিলেন সেক্রেটারি স্যার।
- জয়েন্টের রেজাল্ট তোমার চমকপ্রদ। কীভাবে পড়াশোনা করতে?
- কোচিঙের প্রথম দিকটায় ঠিকমতো পড়াশোনা করতে পারিনি। আব্বা অসুস্থ হয়ে পড়ায় চিকিৎসা করাতে বেঙ্গালুরু নিয়ে যেতে হত। আমাকেই সঙ্গে যেতে হত। মানসিক কষ্টেও থাকতাম। তাই ক্লাস-টেস্ট, মক-টেস্টগুলোয় কোনো বারেই একশোর মধ্যে র‍্যাঙ্ক হয়নি। শেষ তিনটে পরীক্ষায় ১৭, ৮, ১৫ র‍্যাঙ্ক হয়েছিল মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। তখনই মনে হয়েছিল নিটে র‍্যাঙ্ক হয়ে যাবে।

আল-আমীন মিশনে পাঁচ বছর পড়ে আমার যেটা মনে হয়েছে— এখানকার পড়াশোনার পরিবেশটাই স্পেশাল ব্যাপার। এই পরিবেশের মধ্যে পড়ে অনেকেই স্টুডিয়াস হয়ে ওঠে।

নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মুশকিল। কয়েক জন বন্ধুকে দেখলাম সেল্ফ কন্ট্রোলিঙের অভাবেই হারিয়ে গেল।

- ২০১৭ সালের নিট পরীক্ষা তো সমস্যা তৈরি করে ইতিহাস সৃষ্টি করল?
- হ্যাঁ, সেরকমই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বাংলা মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে। একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হওয়ার কথা, শুধু ভাষাটা আলাদা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল আলাদা আলাদা প্রশ্ন, অনেক কঠিনও হয়েছিল, বিশেষ করে ফিজিক্স পরীক্ষা। মোট ৭২০ নম্বরের পরীক্ষা হয়। ৩৬০ নম্বর বায়োলজি, ১৮০ নম্বর করে ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি। আমি বায়োলজিতে ৩২০, কেমিস্ট্রিতে ১৪৫ পেলেও ফিজিক্সে মাত্র ৬৮ নম্বর পেয়েছি। ভাবুন কীরকম প্রশ্ন হয়েছিল। ফিজিক্স পরীক্ষা দিয়ে আমি তো হতাশায় কেঁদে ফেলেছিলাম। বাংলা মাধ্যমের ছেলে-মেয়েদের বঞ্চিত করা হয়েছে। বলা হল অভিন্ন পরীক্ষা, অথচ প্রশ্ন আলাদা। ভয়ে বাংলা মাধ্যমের বহু ছেলে-মেয়ে এ-বছর ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হয়েছে।
- এ-বছর প্রশ্ন কেমন হয়েছে, খবর পেয়েছ কিছু?
- এ-বছর প্রশ্ন একই হয়েছে মোটের ওপর। কয়েকটা শব্দের বাংলা অনুবাদ ভুল হয়েছে। পরীক্ষা ভালো দিয়েছে সবাই শুনলাম।
- তুমি তো মিশনের মধ্যে সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক করেছ শুনলাম। নিট র‍্যাঙ্ক কত হয়েছিল?
- আমার অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ১৪৪৪৫। রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৩৪১।
- কোথায় ভর্তি হলে?
- আমি এন আর এস-এ ভর্তি হয়েছি। আল-আমীন মিশনের মধ্যে টপ র‍্যাঙ্ক করেও কলকাতা মেডিকেল কলেজে সুযোগ হয়নি। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমনটা দেখা যায়নি। বস্তুত বাংলা মাধ্যমের দু-একজন ছাড়া কেউই পায়নি। অথচ মেধাবী পড়ুয়াদের স্বপ্ন থাকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়ার।
- শুখা বাজারেও ভালোই র‍্যাঙ্ক করেছ। কীভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলে, কতক্ষণ পড়াশোনা করতে?
- মোটামুটি ১০-১২ ঘণ্টা পড়েছি। রাত জেগে পড়তাম নির্জনতায় মন দিয়ে পড়ার জন্য। তবে শেষের দু-আড়াই মাস প্রচুর পড়েছি।
- আল-আমীন মিশনের পড়াশোনার কোন দিকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তোমার?
- আল-আমীন মিশনে পাঁচ বছর পড়ে আমার যেটা মনে হয়েছে—এখানকার পড়াশোনার পরিবেশটাই স্পেশাল ব্যাপার। এই পরিবেশের মধ্যে পড়ে অনেকেই স্টুডিয়াস হয়ে ওঠে। প্রচুর পড়াশোনা করেই মধ্যমেধার অনেক পড়ুয়াও ভালো রেজাল্ট করে ফেলে। এটা আল-আমীনের বিশেষ কৃতিত্ব।
- সাফল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়?
- প্রথমত আমার মনে হয়, নিজেকে পরখ করে নাও। নিজের ক্ষমতা-অক্ষমতা যাচাই করে তারপর কোন দিকে যাবে ঠিক করে নাও। দ্বিতীয়ত, লক্ষ্য অর্জনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় সেল্ফ কন্ট্রোলিং। নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মুশকিল। কয়েক জন বন্ধুকে দেখলাম সেল্ফ কন্ট্রোলিঙের অভাবেই হারিয়ে গেল।
- ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ভাবছ?
- এখনও সেভাবে কিছু ভাবিনি। এম.বি.বি.এস. শেষ করে ক্লিনিক্যাল কোনো বিষয়ে এম.ডি. বা এম.এস. করার ইচ্ছে আছে। আমি ছোটো ছোটো লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে ভালোবাসি। সেভাবেই এগোতে চাইছি।
- লক্ষ্য অর্জন করো। ভালো থেকো।
- আপনারাও ভালো থাকুন।

সেরার পরামর্শ

- প্রথমত, নিজেকে যাচাই করতে শেখো। মনে রাখবে, তোমার থেকে ভালো তোমায় কেউ চেনে না।
- মিশনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্লাসগুলো মনোযোগ সহকারে করো।
- পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখার অভ্যেসটাও তৈরি হওয়া চাই।
- মিশনে পড়ার সবথেকে বেশি সুবিধা হল সারাক্ষণ শিক্ষক-শিক্ষিকা আর বন্ধু-বান্ধবদের সংস্পর্শে থাকা। যেকোনো সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান সহজেই হয়ে যায়।
- পড়াশোনায় নিজের দুর্বলতা খুঁজে বের করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। চেষ্টা রাখবে যেন তোমার দুর্বলতাই একদিন তোমার সবলতায় পরিণত হয়।
- যেকোনো কাজেই পরিশ্রমের কোনো বিকল্প হয় না। পড়াশোনাটাও নিশ্চয় তার ব্যতিক্রম নয়।
- পড়াশোনার শেষে কতটা পড়লে সেটা কোনো বড়ো ব্যাপার নয়, কতটা শিখলে সেটাই আসল। সে-ব্যাপারে খেয়াল রাখবে।
- পড়াশোনার বাইরেও একটা পরিবেশ অবশ্যই আছে। তবে খেয়াল রেখো, সেটি যেন তোমার মূল লক্ষ্য না হয়ে পড়ে।
- সচ্চরিত্র গঠনের চেষ্টা করো। বিশ্বাস করো, সৎপথে চলতে অনেক বাধা পেলেও দেখবে এর থেকে মানসিক শান্তি আর কোথাও নেই।
- সর্বোপরি মহান আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখো। তিনি নিশ্চয়ই একদিন তোমার পরিশ্রমের ফল দেবেন। ■

জলজ প্রাণীদের জগৎ বিচিত্র ও রহস্যময়। নানান স্বভাবের গুণে তারা চিরকালের আকর্ষণের বিষয়। তাদের নিয়ে নিরন্তর মানুষের কৌতূহল। তাদের সম্পর্কে জানবার অন্ত নেই। কেউ কেউ মানুষের নিকট-বন্ধু, কেউ-বা দূরত্বে থেকে যায়। এই পাতায় তাদের কথা।

তকচু, নাকি কাছুয়া

এন জুলফিকার

আমাদের সেই সবজান্তা বাবুমশাইয়ের ক-দিন ধরেই পাত্তা নেই। আজ সাতসকালে হঠাৎ এসে হাজির। আমি বললুম, "কী রে, কোথায় ছিলি এতদিন?" সে এক রহস্যের হাসি হাসল। বুঝলাম, গোপন কোনো কথা ফাঁস করবে আজ। তাই দ্বিতীয় বার আর জিজ্ঞাসা না করে চুপ করে রইলুম। আমার দিক থেকে কোনো কৌতূহলের আভাস না পেয়ে সে নিজেই এবার মুখ খুলল। আচমকা প্রশ্ন করে বসল, "আচ্ছা, বল তো, ফরাসিরা 'তকচু' বলে কাকে?" এই রে, জানি না তো! অগত্যা বলে ফেললুম, "জানি না রে।" ও যেন এমন উত্তরের অপেক্ষাতেই ছিল। তাই আরও উৎসাহিত হয়ে বলল, "বেশ। আরবরা কাকে 'সুলহাফাত' বলে? কিংবা, জার্মানরা বলে 'শিটকুইটা'?" আমি আবারও মাথা নাড়লাম। সে এবার চোখ নাচিয়ে ভ্রূ কাঁপিয়ে বলল, "হিন্দিতে কাছুয়া কাকে বলে নিশ্চয়ই জান?' এ আর জানব না! আমি তৎক্ষণাৎ বললুম, "কাকে আবার, কচ্ছপকে।" সে হেসে বলল, "আমার ওই চারটি প্রশ্নের উত্তরও একটাই— কচ্ছপ। আজ দেখে এলুম তিন বস্তা 'তারা কচ্ছপ'।"

আমার কৌতূহল হল। বললুম, "কোথায়?"

—"ওই তো শিয়ালদা স্টেশনে। পাচার করার সময় ধরা পড়েছে।"

—"কচ্ছপ শিকার করা, মারা বা বিক্রি তো নিষিদ্ধ। ধরা পড়েছে কেউ?"

—"নাহ্! পুলিশ দেখেই তারা বস্তা ফেলে পালিয়েছে।"

এতক্ষণে বর্ষা এসে আমাদের আড্ডায় যোগ দিয়েছে। সঙ্গে পুচকে বিহানও। আমি অ্যানিম্যাল ডিকশনারি থেকে একটা ছবি দেখিয়ে বিহানকে বললুম, "বল তো, এটা কী?" সে তৎক্ষণাৎ বলল, "তরটোইজ।" বর্ষা বলল, "তরটোইজ নয় রে ভাই। বল, টরটোইজ।" বিহান ক্রমাগত বলেই চলল, "তরটোইজ, তরটোইজ, তরটোইজ।"

আমি বললুম, "ঠিক আছে, বর্ষা। দু-বছর বয়সে ও ভালোই বলেছে। পরে শুধরে দিবি। কিন্তু তুই কি জানিস, কচ্ছপ এই পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন প্রাণীদের মধ্যে একটা?"

"না তো, কত বছর ধরে এরা পৃথিবীতে আছে?"

"তা প্রায় কুড়ি কোটি বছর তো হবে।"

বর্ষা ভারি অবাক হয়ে বলল, "কুড়ি কোটি!"

"শুধু তাই নয়। এরা বাঁচেও অনেক দিন। কচ্ছপের গড়আয়ু মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। আমেরিকান বক্স টার্টেল প্রভৃতি প্রজাতির কচ্ছপ প্রায় একশো থেকে দেড়শো বছর বাঁচে।"

ওর সবজান্তা কাকু বলল, "হ্যাঁ রে। তা ছাড়া পূর্ণবয়স্ক একটি বড়ো প্রজাতির কচ্ছপ প্রায় আট ফুট লম্বা হয়। তখন তাদের ওজন হয় প্রায় সাড়ে আটশো কেজি।"

"আচ্ছা কাকু, কচ্ছপের নাকি দাঁত নেই?"

"ঠিকই। তবে তাদের দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি খুব প্রখর। কচ্ছপের কান নেই। তা ছাড়া দেখেছিস তো ওরা স্পর্শটা খুব ভালো বোঝে। কোনো কিছু দিয়ে পায়ে বা মাথায় স্পর্শ করলেই ওরা সঙ্গে সঙ্গে খোলসের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। জানিস তো, ওদের দেহের খোলসটা ষাটটা হাড় জুড়ে জুড়ে তৈরি হয়েছে। অত শক্ত খোলসের জন্যই তো ওরা ডাঙা বা গভীর সমুদ্রের নানা প্রতিকূল পরিবেশেও এত বছর ধরে বেঁচে থাকে।"

বর্ষা বলল, "কচ্ছপ সম্বন্ধে আমি যা যা জানি তা বলি?"

"নিশ্চয়ই।"

"এদের পা চারটে। আর আছে খুব শক্তপোক্ত ঠোঁট বা মুখ, কিন্তু কোনো দাঁত নেই। এরা সাধারণত ডাঙায় বাস করে। খায় ঘাস, পড়ে থাকা ফলমূল, পাতা এবং কখনো-বা মৃত প্রাণীর গলে যাওয়া মাংস। কচ্ছপ মাটি বা বালির নীচে এক-এক বারে সাত-আটটা ডিম পাড়ে। তারপর ডিম ফোটার জন্য অপেক্ষা না করে সেই স্থান ত্যাগ করে মা-কচ্ছপ চলে যায়। তিন-চার মাস পরে মাটির নীচে আপনা থেকেই ডিম ফুটে কচ্ছপছানারা বাইরে বেরিয়ে আসে। ওই ছানাদের পরিচর্যা করার কেউ নেই। বেচারা! তারা নিজেরাই এই প্রকৃতি-মায়ের কোলে বড়ো হয়।"

"একদম ঠিক বলেছিস। তবে এদের পায়ের পাতায় ক-টা আঙুল থাকে, তা বলিসনি। এদের পায়ের পাতায় সাধারণত পাঁচটা আঙুল হয়। তবে আমেরিকান বক্স টার্টেল ও অন্য দু-একটি প্রজাতির ক্ষেত্রে আঙুলের সংখ্যা চার, কখনো-বা তিন। জেনে রাখ, কচ্ছপের পিঠের শক্ত খোলসকে বলে ক্যারাপেস আর পেটের দিকের শক্ত খোলসকে বলে প্ল্যাস্ট্রন।"

সে এবার বলল, "আব্বু, তুমি-না বলেছিলে, কচ্ছপ কী করে শক্ত খোলস পেল, তা নিয়ে একটা চমৎকার গল্প আছে?"

"ঠিক গল্প না। আমেরিকার প্রাচীন আদিবাসীদের মধ্যে তা নিয়ে একটা উপকথা প্রচলিত আছে।"

বর্ষা বায়না ধরল, "বলো না আব্বু, বলো না।"

"ঠিক আছে। শোন:

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। আমাদের এই সবুজ পৃথিবীটা তখন একটু একটু করে গড়ে উঠছে। সে-সময় নরম সবুজ ঘাসে ঘেরা সুন্দর একটা জায়গায় এক কচ্ছপ থাকত। চারপাশে কাচের মতো স্বচ্ছ জলের ঝরনা আর অপূর্ব সব বাহারি গাছ। সেখানে সারাক্ষণ রোদ ঝলমল করে। শুধু শীতে জায়গাটা অসম্ভব ঠান্ডা। প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে বাঁচতে প্রাণীরা তাই সে-সময় শীতঘুমে দিন কাটাতে বাধ্য হয়।

সেদিন ক্রিসমাস। বেজায় ঠান্ডা পড়েছে। শীতঘুমে চলে যাওয়ার আগের রাতের ভোজসভায় সব্বাই জড়ো হয়েছে। সন্ধ্যা থেকেই আনন্দে আর হইহুল্লোড়ে মত্ত সকলে। কচ্ছপ শুধু মনমরা। কিছুই ভালো লাগছে না তার। শীত এলেই সে তার বন্ধুদের খুব হিংসে করে। সে দেখে সবার দেহে কেমন লোমের ঢাকনা। কারো-বা শক্ত খোলসে দেহ মোড়া। ঠান্ডা তাই ওদের তেমন কাবু করতে পারে না। বেচারা কচ্ছপের সেসব কিছুই নেই। সারা শীতকাল ধরে সে হু হু করে কাঁপে আর নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য আপশোস করে।

সে-রাতে ক্রিসমাসের ভোজ খেতে এসে তার বন্ধু শামুক বলল, 'কী বন্ধু, কেমন আছ?'

'ভালোই আছি। আমার খবর না নিয়ে তুমি বরং নিজের চরকায় তেল দাও!'

বন্ধুর এমন খারাপ ব্যবহারে খুবই দুঃখ পেল শামুক। দরজা বন্ধ করে সে ফিরে গেল নিজের ঘরে। একটু পরে কচ্ছপের আর-এক বন্ধু পেলিক্যান এল রাতের ভোজসভায়। কচ্ছপের হাতে সে তুলে দিল ক্রিসমাসের উপহার। উপহারের বাক্সটা হাতে পেয়েই আনন্দে কচ্ছপ তাড়াতাড়ি তার মোড়কটা খুলে ফেলল। আর তারপর? উপহারটা সশব্দে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল সে। রেগেমেগে বলল, 'তোমার এই উপহার আমার দরকার নেই! তুমি যা এনেছ তা আমার আছে।'

খুব কষ্ট পেল বেচারা পেলিক্যান। মনের দুঃখে রাতের খাবার না খেয়ে সে ঝনাৎ করে দরজা বন্ধ করে ফিরে গেল। ওরা চলে যেতেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করল কচ্ছপ। আসলে ওর দুঃখ কেউ বোঝে না। সে তো বন্ধুদের কষ্ট দিতে চায় না। মনের দুঃখে কচ্ছপ বিড়বিড় করে

সবচেয়ে বড়ো কচ্ছপ হল লেদারব্যাক টার্টল, আর সবচেয়ে ছোটো প্রজাতি বোগ টার্টেল। এরা মাত্র চার ইঞ্চি লম্বা। পরিযায়ী পাখিদের মতো কয়েক প্রজাতির কচ্ছপও পরিযায়ী, তারা কয়েক হাজার মাইল ঘুরে আবার পূর্বের জায়গায় ফিরে আসে।

বলল, 'আসলে আমি উপহার চাই এমন কিছু, যা আমাকে শীতের হাত থেকে বাঁচাবে। শীতে যে বড্ড কষ্ট পাই আমি।' এমনসময় জানালা দিয়ে কাদার দেবতা ওর আক্ষেপ শুনে কষ্ট পেল, আর মনে মনে ঠিক করল কচ্ছপের জন্য কিছু একটা করতে হবে।

পরদিন সকালে কচ্ছপ ঘন থকথকে কাদার ওপর দিয়ে হাঁটছিল। খানিক পরে একটু ঝিমুনি আসতেই সে কাদার ওপর বসল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। তখন যুক্তি করে মাটি ও গাছের দেবতারা তার সারাদেহ চটচটে আঠালো মাটি দিয়ে ঢেকে দিল। কচ্ছপ আরামে ঘুমিয়েই রইল। সে এত আরাম পেয়েছে যে, ঘুম আর তার ভাঙে না। কিছুদিন পরে বসন্ত এল। তখন ঘুম ভাঙল কচ্ছপের। সে অবাক হয়ে দেখল, তার সারাদেহ শক্ত খোলস দিয়ে ঢাকা। ভারি আনন্দ হল তার। প্রায় নাচতে নাচতে সে তার বন্ধুদের কাছে গেল। আর তার দুর্ব্যবহারের জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চাইল। আর তারপর? তারপর বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে দিন কাটতে লাগল তার। তখন থেকেই নাকি সব কচ্ছপের দেহ শক্ত খোলস দিয়ে ঢাকা।"

বর্ষা বলল, "বাহ্! কাহিনিটা তো খুব সুন্দর।"

"হ্যাঁ রে। প্রতিটি উপকথাই খুব চমৎকার হয় সাধারণত।"

এতক্ষণে আমার সেই খুদে সবজান্তা বন্ধু বলল, "আজ যে-কচ্ছপ দেখে এলুম, তার সারাপিঠে অনেকগুলো তারার মতো নকশা কাটা।"

আমি বললুম, "ও, ওগুলো ইন্ডিয়ান স্টার টরটোইজ। এরা সাধারণত আকারে ছোটো হয় আর ডাঙায় বাস করে। আর তাই এদের কাছিমও বলা হয়।"

"আচ্ছা আব্বু, এই পৃথিবীতে কত প্রকার কচ্ছপ আছে?"

"তা প্রায় ২৫০ প্রজাতির। সবচেয়ে বড়ো কচ্ছপ হল লেদারব্যাক টার্টল, আর সবচেয়ে ছোটো প্রজাতি বোগ টার্টেল। এরা মাত্র চার ইঞ্চি লম্বা। পরিযায়ী পাখিদের মতো কয়েক প্রজাতির কচ্ছপও পরিযায়ী, তারা কয়েক হাজার মাইল ঘুরে আবার পূর্বের জায়গায় ফিরে আসে।"

তোমরা যারা এই লেখা পড়ছ, তারা কি জান, কচ্ছপ নিয়ে বিভিন্ন দেশে কিছু অন্ধ বিশ্বাস আছে। থাইল্যান্ডের অধিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, যদি কেউ কোনো কচ্ছপকে মুক্তি দেয়, তাহলে সে বিষণ্ণতা ও দৈন্যদশা থেকে মুক্তি পাবে। আবার ভিয়েতনামীরা মনে করে, যদি তুমি কোনো রাস্তা দিয়ে কচ্ছপকে পেরোতে দেখ, তাহলে তোমার পরিকল্পনায় বাধা আসবে। এদিকে চীনারাও বিশ্বাস করে, যদি কেউ কচ্ছপের গায়ে মৃদু মৃদু চাপড়ায় তাহলে কচ্ছপ তার জন্য সৌভাগ্যের দরজা খুলে দেয়। আর আঙ্গোলার অধিবাসীদের বিশ্বাস, যদি কেউ দরজার নীচে কচ্ছপের খোলস পুঁতে রাখে তাহলে সে শত্রুর উপস্থিতি আগেভাগে জেনে যাবে। সত্যি, মানুষের মনে কত যে সংস্কার!

কচ্ছপ সম্পর্কে আরও দুটো চমৎকার তথ্য হল— আন্টার্কটিকা ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র কচ্ছপ দেখা যায়, আর মরুভূমিতে যেসব কচ্ছপ বাস করে, তারা ১৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রাতেও দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে! ■

শিখরের কাছাকাছি যারা, যারা উজ্জ্বলতর জীবন-জীবিকার জগতে একদিন পৌঁছোবে অবশ্যই— সেই সম্ভাবনাময়দের নিয়ে এই পাতা। লিখেছেন

সেলিম মল্লিক

আশার দৃষ্টি নিষ্ফল হবে না

সব প্রাণী আর সব উদ্ভিদ বাঁচে। কিন্তু বাকি সকলের সঙ্গে মানুষের বেঁচে থাকার একটা মস্ত বড়ো তফাত, সে শুধু জৈবিকভাবে বা দেহের দ্বারা বাঁচে না, সে বাঁচে মনের মাধ্যমে। এই মনের মাধ্যমে বাঁচার কাজটি মানুষের গভীর সাধনার ও ইচ্ছার ভেতরে নিহিত। আমরা জানি, মানুষের যে-মন, তা সৃষ্টির সূচনা থেকেই সত্তার ভেতরে স্থিত। এবং বলা বাহুল্য, পদ্মের পাতার মতো গুটিয়ে ছিল শুরুর দিনগুলিতে। যত দিন গেছে, সে বিকশিত হয়েছে। তার বিকাশ এখন সর্বত্র এবং আকাশময়। তবু এই মনকে আমরা চিনেও চিনি না, দেখেও দেখি না, বুঝেও বুঝি না। আর এসব যে ঘটে, তা স্বভাবের সঙ্গে সাধনার সংঘাতের দরুনই ঘটতে থাকে। তাও এ-কথা না স্বীকার করে উপায় নেই, এই সংঘাতের ভিতর দিয়ে মানুষ মনের প্রকৃতি অবলোকন করেছে। এই মন বুদ্ধিরও অতিরিক্ত। বুদ্ধির বিকাশ আমাদের যে-সামর্থ্য দিয়েছে, সেই সামর্থ্যের জোরে এখন মন নিয়ে আমরা আরও দূর যেতে চাই। মানুষের ঊর্ধ্বায়ন বুদ্ধির সাহায্যে প্রাথমিকভাবে, কিন্তু মনের সাহায্যে শেষপর্যন্ত ঘটবে। তবেই মানুষের মুক্তি। সমস্ত জড়তা থেকে, সমস্ত অচৈতন্যের অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়াই মানুষের অন্তিম অভীপ্সা। শিক্ষার পরমার্থ এখানেই, কিন্তু এই পরমার্থ লাভের আগে সাধারণভাবে সামাজিক মানুষ এর একটা বস্তুগত চাহিদা অনুভব করে। সেই চাহিদাই তাকে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে যায় দিগন্তের দিকে। সেখানে জীবন জগতের মতোই বড়ো। তবু আজও দুর্ভাগ্যের কানাগলিতে কত-যে মানুষ আটকে আছে। কেউ টেনে আনতে চাইছে তাদের। কেউ কেউ বড়ো রাস্তার আলোয় নিজেকে দেখে সবিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়ে আরও আরও আলো পান করে উজ্জ্বল হতে চাইছে। হতে চাইছে আত্মদীপ। বলতে দ্বিধা নেই, এই আত্মদীপ হওয়ার প্রেরণায় যেন নিজেকে নিযুক্ত রেখেছে আল-আমীন মিশন। বাঙালি, আজকাল বাংলার সীমা অতিক্রম করে অন্য রাজ্যেও, সে অবজ্ঞাত স্তরে পড়ে থাকা মুসলমান সমাজের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বার্তা বয়ে নিয়ে চলেছে। তাদের মধ্যে জন্ম থেকেই যে-সম্ভাবনাগুলো সুপ্ত হয়ে আছে, তা যেন উসকে জাগিয়ে দিয়ে পল্লবিত করতে চাইছে। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে প্রতিবন্ধকতার পথে পাড়ি দিতে তাদের সঙ্গী হয়েছে। এর ফলস্বরূপ, আমরা এই সমাজের অজানা অনামা স্থান থেকে এইসব ছেলে-মেয়েদের উত্থান লক্ষ করছি, যা কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল নিতান্ত কাল্পনিক। আজ এখানে চারজন পড়ুয়ার কথা বলব। এতক্ষণের কথাগুলো তাদের নিয়ে কথা বলবার ভূমিকা। ভূমিকা না করলেই হত, কিন্তু নিজেকে চিনবার আগে এটুকু হয়তো অনিবার্য হয়ে পড়ল। জানি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি, যদি বিচলিত না হয়, এরা একদিন দিগন্তে আলোর আভা হয়ে ভেসে যাবে। যে-আলোর দিকে তাকিয়ে বসে আছেন বঞ্চনায় শতছিন্ন আমাদের পূর্বপুরুষের দল। তাঁদের সে আশার দৃষ্টি নিষ্ফল হবে না নিশ্চয়।

আফতাব আহামেদ।

ধরা যাক, আফতাব আহামেদের কথা। অধুনা পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানার চাকটা গ্রামে তার বাড়ি। যাঁরা ওই অঞ্চল সম্পর্কে জানেন বা ওখানকার সাধারণ মুসলমান পরিবারগুলোর আর্থসামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অবগত, তাঁদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে বিরাট এক হা-অন্ন আর হতাশ সব জনমানুষের পটচিত্র। কিন্তু যাঁরা জানেন না, তাঁদের বলি, এখনও ওসব অঞ্চল আধুনিক সভ্যতার স্পর্শ থেকে বহু দূরে আদুড় শরীরে প্রকৃতিলীন হয়ে আছে। এই অর্থে এমন এক প্রাকৃতিকতার স্বাদ পাওয়া যায়, যা ভেবেও ভালো লাগে যে, এখনও ওরা, ওসব এলাকার লোকসাধারণ মাটির মাধুর্য ভুলে যায়নি। কিন্তু যখন ভাবি, তাদের মন মাটির কিনারে মুখ কালো করে আজও পড়ে আছে, ওপরে চোখ তুলে দেখতে পায় না বিপুল বিস্তার, তখন ভাবনা ভারাক্রান্ত হয়। ওই পরিবেশে আফসা খাতুন ও আনিসুর রহমানের নিতান্ত দীন পরিবারে আফতাবের জন্ম। গত শতাব্দীর একেবারে শেষ লগ্ন, অর্থাৎ ২০০০ সালের ৯ মে তাঁর জন্মের কাল। বাবা কলকাতার তপশিয়া অঞ্চলে এক ব্যাগ কারখানায় কাজ করেন। বুঝতেই পারা যাচ্ছে— উপার্জন নামমাত্র। তার মানে আক্ষরিক অর্থে আফতাব গরিবঘরের সন্তান। তার তিন দিদি আছে। তাঁরা স্নাতক স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। আফতাবের বুনিয়াদি শিক্ষা একটা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। তারপর পঞ্চম শ্রেণি থেকে আল-আমীন মিশনে। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল মিশনের পাইকপাড়ি

ইনামুল হোসেন খান।

শাখা থেকে। ২০১৭ সালে সে ৬৮০, অর্থাৎ ৯৭.১ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাস করে। সর্বোচ্চ নম্বর গণিত ও ভূগোলে। এই দুটি বিষয়ে তার প্রাপ্ত নম্বর ১০০ করে। গোটা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ভেতরে তার স্থান একাদশ আর আল-আমীনের মধ্যে দ্বিতীয়। মাত্র ১০ নম্বরের তফাত রাজ্যের প্রথম হওয়া পরীক্ষার্থীর থেকে। এখন মিশনের নয়াবাজ শাখায় দ্বাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত। পদার্থবিদ্যা প্রিয় বিষয় আফতাবের। স্বপ্ন দেখে পদার্থবিদ্যা নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করে নিজের স্বাক্ষর রাখতে। তবু তাদের আর্থিক সমস্যার কথা ভেবে ডাক্তার হওয়ার চেষ্টাও সে করে চলেছে। স্পষ্ট ভাষায় জানাতে দ্বিধা করল না সে, এত অসচ্ছলতার মধ্যে বড়ো হয়েছে, পরিবারে এত অনটন দেখেছে, যদি দ্রুত এবং সম্মানজনক উপায়ে অর্থ উপার্জন করে এতকালের দারিদ্র্য মোচন করতে পারে, তাতে সে সবচাইতে বেশি তৃপ্ত হবে। বাড়ির সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষাও তা-ই। ফুটবল খেলা আর গোয়েন্দা-গল্প পড়া আফতাবের প্রিয় বিনোদন। গানও শোনে, তবে অল্প বাজনাযুক্ত। এই পছন্দটি দিয়ে তার মনের ধরনটা অনেকদূর আন্দাজ করা সম্ভব। এই চুপচাপ শান্ত মনের ছেলেটি একদিন জীবনে-জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হবে, এটা কল্পনা করেই সুখ হচ্ছে।

যখন আফতাবের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন পাশটিতে চুপচাপ বসেছিল ইনামুল হোসেন খান, আর নিজেকে প্রস্তুত করছিল কথায় কথায় আপনাকে ব্যক্ত করবার। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, জীবনের সব বিষয়ের জন্য একটা প্রস্তুতি লাগে। এখান থেকে ভাবা সম্ভব— লেখাপড়ার কাজে সে কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে! অতিশয় গরিবঘরের সন্তান সে। তাদের একটা ছোটোখাটো মুদির দোকান আছে। উপার্জন যা হয়, তাতে সংসার চালানো আজকের দিনে খুবই সমস্যার, তবু ইনামুলের বাবা সাহাজামাল খান ও মা গুলফুনেসা বিবি তাঁদের পাঁচ ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া করানোর অর্থ জোগাতে পিছ-পা হননি। তাঁরা বুঝেছেন, আর নয়, এবার পরের প্রজন্মকে আলোকিত জীবনের বারান্দায় দাঁড় করাতে হবেই। তার জন্য চাই শিক্ষা। আর ওই শিক্ষার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে অনেক অনেক ওপরে। যেখানে পৌঁছোতে পারলে জীবনের মানেই পালটে যায়। মনে হবে মানুষ সত্যিই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। ইনামুলের জন্ম ১৯৯৯ সালের ২ জুন। মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুরের নারিকেলবাড়ি গ্রামের এই নিমগ্ন স্বভাবের ছেলেটি বুনিয়াদি শিক্ষা নিয়েছে এলাকার এক সাধারণ বেসরকারি স্কুলে। তারপর ক্লাস ফাইভ থেকে আল-আমীন মিশনের পড়ুয়া। ভর্তি হয়েছিল মিশনের মুর্শিদাবাদ জেলার মহম্মদপুর শাখায়। ওখান থেকে ২০১৭ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছে ৬৪০ অর্থাৎ ৯১.৪ শতাংশ নম্বর। এখন ইনামুল মিশনের নয়াবাজ শাখায় দ্বাদশ শ্রেণি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। মাধ্যমিকে তার বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে জীবনবিজ্ঞানের নম্বর ছিল সবচাইতে বেশি। এবং জীববিদ্যাই তার প্রিয়তম বিষয়। আর ওই বিদ্যার প্রতি গভীর আগ্রহ তাকে ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে প্রেরণা জোগায়। অনেক পড়ুয়া যেমন নানান আর্থসামাজিক কারণে ডাক্তার হতে চায়, ইনামুলের বিষয়টা কিন্তু সেরকম নয়। তার ডাক্তারি পড়বার আকাঙ্ক্ষার কারণ কিন্তু বিষয়টির প্রতি অনুরাগ। তাই আশা করা যায়, সে তার অভিপ্রায়ে একদিন নিশ্চয় কৃতবিদ্য হয়ে উঠবে। কারণ, গভীর অনুরাগ মানুষকে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে ঠিক পৌঁছে দেয়। তার প্রসঙ্গে অতি চমৎকার একটা কথা সে শোনাল, আগে নাকি ইনামুল ছিল তথাকথিত লেখাপড়ায় ফাঁকি দেওয়া ছাত্র। কিন্তু মিশনের এক বাংলার মাস্টারমশাই, নাম রুজভেল্ট স্যার, তিনি অষ্টম শ্রেণি থেকে ইনামুলের প্রেরণাদাতা হয়ে তার মানসিকতা সদর্থে বদলে দেন। সেই থেকে ইনামুল তাঁর প্রেরণায় নিজের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংকল্পে অটল।

সাবিনা ইয়াসমিন। সামিনা খাতুন।

এখন দু-জন ছাত্রীর কথা বলব। একজন সাবিনা ইয়াসমিন। মিশনের মেমারি শাখায় দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী। বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনার নারায়ণপুর গ্রামে। গ্রামটি বারাসাত শহর থেকে বাসে ৩৫ মিনিটের রাস্তা। বাড়ি বলতে মামার বাড়ি। তার বাবা হাফিজুল ইসলাম, মা ফতেমা বিবি। কিন্তু সাবিনার সব দায়দায়িত্ব তার চার মামার। ওর এক ভাইও আছে, নাম ওমর ফারুক। সে গ্রামের সরকারি স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে। ২০০০ সালের জাতিকা সাবিনা ২০১৭ সালে গ্রামের সরকারি স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিল ৯০ শতাংশ অর্থাৎ ৬৩০ নম্বর। পরে তার মাসতুতো দাদার উদ্যোগে আল-আমীনে আসা। লক্ষ্য ভবিষ্যতে ডাক্তারি পড়া। সে মনে করে মিশনে পড়তে এসে এই এক বছরে তার যা পরিবর্তন হয়েছে, যদি আরও নীচু ক্লাস থেকে এখানে পড়বার সুযোগ পেত, তার লেখাপড়ার চেহারাটা অন্যরকম হতে পারত। তার মতে, আল-আমীন পড়ুয়াদের যে আন্তরিকতা ও যত্নে পঠনপাঠনে ডুবিয়ে রাখে, যা শুধু ভালো ফল করায় না, আকাঙ্ক্ষাকে সুদূরপ্রসারী করে নতুন স্বপ্নে ভাসিয়ে রাখে। ভাসতে ভাসতে একজন পড়ুয়া যে শেষপর্যন্ত বহু বহু দূর যেতে পারে, তা অনেকের কাছে কল্পনার হলেও, আল-আমীনের পড়ুয়াদের কাছে গভীর প্রত্যয়ের জিনিস। সাহিত্যপাঠ ও পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছায় তার মনের সুকোমল দিকটিকে দেখতে পাওয়া গেল। সে মনে করে, সৌন্দর্যের বোধ জীবনকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড়ো সহায়ক। আর পূর্ণ হতে চাওয়াই তো শিক্ষিত হতে চাওয়ার নামান্তর।

লেখা শেষ করব মেমারি শাখার দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের আর-এক ছাত্রী সামিনা খাতুনের কথা বলে। সামিনার বাড়ি বাঁকুড়া জেলার বৈতলে। জায়গাটা বাঁকুড়া-পশ্চিম মেদিনীপুর-হুগলির সীমান্ত আরামবাগের কাছে। ২০০১ সালে জন্ম সামিনার। বাবা খোদা বক্স সা, মা মনুয়ারা বিবি। তাদের পারিবারিক জীবিকা ধান ও আলুর চাষ। ওর এক দাদা আছেন, ইংরেজিতে এম.এ. ক্লাসে পড়ছেন। খুব ভালো লাগল শুনে, সামিনা, তাদের এলাকার জয়রামবাটীর প্রসঙ্গ নিজের থেকে তুলে সেখানকার স্থানমাহাত্ম্যের জন্য যখন শ্লাঘা অনুভবের কথা জানাল। মেধাবিনীদের প্রয়োজন, কিন্তু এমন সংবেদী মানুষের বোধ হয় আরও বেশি দরকার আজ। সে যাই হোক, সামিনা নিজের গ্রামের সরকারি স্কুল থেকে ২০১৭ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ৮৮.৭১ শতাংশ অর্থাৎ ৬২১ নম্বর পেয়েছে। ভৌতবিজ্ঞানে তার সর্বোচ্চ নম্বর থাকলেও সে ডাক্তারি নিয়েই ভবিষ্যতে পড়তে চায়। এবং এই লক্ষ্যেই আল-আমীনে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া। তার কথায় কথায় উঠে এল আল-আমীনের প্রতি এমন এক নির্ভরশীলতার দিক, যেন বাঙালি মুসলমান সমাজে, বিশেষ করে বিত্তহীনেরা, এই মিশনের হাত ধরে সত্যিই আর্থিক প্রতিবন্ধকতা অশিক্ষার প্রতিকূলতা থেকে উদ্ধার পাবে। এ-মিশন যেন আজ এদের পারানির নাও। অকূল জলরাশি পার করে যে পৌঁছে দেবে ভবিষ্যতের এমন এক ভূখণ্ডে, যা এক সব-পেয়েছির দেশ। ■

বিচিত্র এই বিশ্বে কত তথ্য আর তত্ত্ব, তার সীমা নেই শেষ নেই কোনো। এই বৈচিত্র্যের কারণে জগৎ অপার আনন্দময় ও বিস্ময়ের। এসবের কোনোটা সংবাদ শিরোনামে আসে, কোনোটা আসে না। এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ টুকরো খবর নিয়ে এই পাতা। লিখছেন

ফরিদা নাসরিন

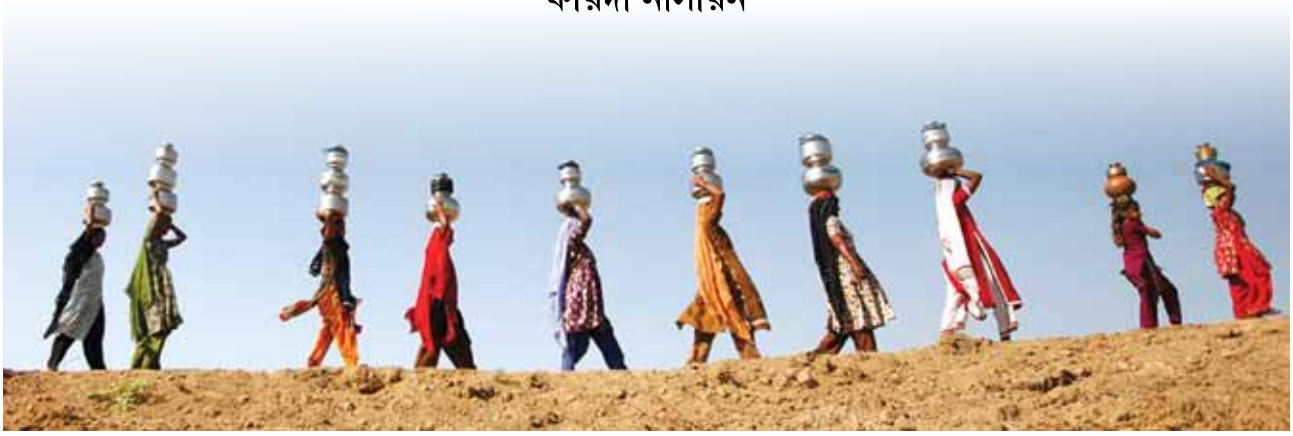

জল

বর্ষার আগে প্রতিবারই সতর্ক করা হয়— মশকবাহিত রোগ থেকে বাঁচতে বাড়ির আশপাশে কোথাও জল জমিয়ে রাখবেন না। জমা জলে মশা জন্মায়। এই সতর্কবার্তা থেকেই আমরা জানতে পারি অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি— জলে প্রাণের জন্ম। জল না থাকলে পৃথিবীর কোনো প্রাণেরই— উদ্ভিদ হোক বা প্রাণীকুল— জন্ম হত না। তাহলে জলকে একটু দেখতে হবে।

প্রথমেই দেখি শব্দটিকে।

জল শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ধাতু জল্ (+অ=জল) থেকে। আমাদের রাজ্যে বাংলায় জল শব্দটি এমনই প্রামাণ্য হয়ে গেছে যে, এর কোনো প্রতিশব্দের গ্রহণযোগ্যতাও নেই। ওদিকে, অর্থাৎ বাংলাদেশে, সরকারিভাবেই বলা হয় পানি। পানি সেখানে প্রামাণ্য শব্দ। যদি সংখ্যার হিসেবে ধরি, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বাংলাভাষী মানুষ পানি শব্দটিই ব্যবহার করেন। এটিও এসেছে সংস্কৃত থেকে, একটু পরিবর্তিত হয়ে। উৎস হচ্ছে পানীয় শব্দ [সংস্কৃত ধাতু পা (+ অনীয়)]।

পৃথিবীর বাইরে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও জলের অস্তিত্ব আছে কি না, এখনও পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি। জল এত দরকারি পদার্থ যে, অন্য গ্রহে জলের অনুসন্ধানেই কত লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, তার হিসেব করাই বেশ শক্ত।

এত গুরুত্বময় একটি রাসায়নিক পদার্থ কতটা রয়েছে এই পৃথিবীতে? একটি অক্সিজেন পরমাণু আর দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু (H_2O)-র মিশেলে যে রাসায়নিক পদার্থটি তৈরি হয়েছে, সেই জলকে আমরা তিনটি রূপে দেখতে পাই। কঠিন (বরফ), তরল (যাকে জল বলি) আর বাষ্পীয় (মেঘ, কুয়াশা) আকারে। বিজ্ঞানসম্মত নামটি প্রায় ব্যবহৃতই হয় না আর, সেটি হল ডাইহাইড্রোজেন মনোক্সাইড। নামটি যেন জলের মতো নয়!

রঙিন মানচিত্রে যে গোলাকার পৃথিবীকে আমরা দেখি, সেখানে জলের রং নীল। আর, সেটা আমাদের প্রিয় গ্রহের ভূপৃষ্ঠের ছবি। এই ভূপৃষ্ঠের ৭০.৯ শতাংশ এলাকা জুড়েই নীলের অর্থাৎ জলের বিস্তার। এর প্রায় সবটাই আসলে মহাসাগর। পৃথিবীতে মোট যত জল রয়েছে, তার ৯৬.৫ শতাংশই এইসব মহাসাগরের জল।

আমরা এখন অবিরাম ভূগর্ভ থেকে জল তুলছি। শহরে— এবং গ্রামেও— দৈনন্দিন গৃহকাজে ব্যবহারের জন্যে যেমন, তেমনই কৃষিকাজে সেচের জন্যে। একবারও ভাবছি না, মাটির তলায় কতটা জল রয়েছে। হিসেব করলে দেখা যাবে, ভূগর্ভে সঞ্চিত জল রয়েছে পৃথিবীর মোট জলের মাত্র ১.৭ শতাংশ! পরিমাণটা কিন্তু ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো। যেকোনো দিন পাতালের ওই জল শেষ হয়ে যাবে। তখন? তখন যা হওয়ার হবে, এখন তো বাঁচি— আমাদের মনোভঙ্গি এমনই। বাস্তবিক, প্রাণধারণের

মতো জল পৃথিবীতে খুবই কম। এত যে জল রয়েছে, তার মাত্র ২.৫ শতাংশ বিশুদ্ধ জল। তাহলে বেঁচে আছি কী করে? অশুদ্ধ জলকে ফুটিয়ে বা নানা কৃত্রিম উপায়ে বিশুদ্ধ করে আমরা পান করি। বললাম বটে, কিন্তু জীবাণুমুক্ত জল সব মানুষ পায় কি? না, পায় না। বিশুদ্ধ জলের পরিমাণ

দিন দিন বাড়লেও এখনও মোটামুটি সুপেয় জল থেকে বঞ্চিত প্রায় একশো কোটিরও বেশি মানুষ। আর, আড়াইশো কোটি মানুষের নেই স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার। জল এখন এমন সম্পদরূপে গণ্য হয়েছে যে, একটা দেশের মাথাপিছু সুপেয় পানীয় জলের পরিমাণের ওপর দেশটির উন্নয়নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নির্ধারিত হচ্ছে। অথচ একজন মানুষ জল ছাড়া গড়ে মাত্র তিন দিন বেঁচে থাকতে পারে।

জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনে জলের ভূমিকা অপরিহার্য। বহু উন্নয়নশীল দেশে সে-দেশের মোট জলের প্রায় ৯০ শতাংশই ব্যবহৃত হয় সেচের কাজে। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলিতেও জলের সিংহভাগই খরচা হয়ে যায় সেচে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মার্কিন দেশে বিশুদ্ধ জলের প্রায় ৩০ শতাংশই সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়। মোটকথা, মানুষের ব্যবহৃত বিশুদ্ধ জলের প্রায় ৭০ শতাংশই খরচ হয় কৃষিকাজে।

পর্যবেক্ষকরা অনুমান করছেন, ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মানুষ জলসংকটে পড়বে। ২০০৯-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে বেশ কিছু উন্নয়নশীল অঞ্চলে জোগানের তুলনায় জলের চাহিদা ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। এ ছাড়া দেশের শিল্প-উৎপাদনের সঙ্গে জলের সুস্পষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, জল বহু রাসায়নিক পদার্থের দ্রাবক হিসেবে কাজ করে এবং বিভিন্ন শিল্পে শীতলীকরণ এবং পরিবহণের কাজে সহায়তা করে। এইভাবে জলের খরচ বাড়তে থাকলে, আশঙ্কা করা হচ্ছে, বিশ্ব-অর্থনীতিতে জল একটা সময় হয়তো-বা পেট্রোলের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অতএব, সাবধান। জলের মতো টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে— এমন কথা বলবার সুযোগ বেশি দিন থাকবে কি না এখনই ভাবতে হবে আমাদের। কেননা, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন মানুষ বলবে— টাকার মতো জলের খরচ যেন না হয়!

নিঃসঙ্গা দুর্গ

আয়তনের বিচারে বৃহত্তম আরব দেশ সৌদি আরব। সৌদি আরবের মরুভূমির বুকে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন সভ্যতার হাজারো ইতিহাস। সেসব প্রাক্-ইসলামি যুগের কথা।

এখন প্রায় একশো শতাংশ ইসলাম-ধর্মাবলম্বীর বাস সৌদি আরবে। কিন্তু দেড় হাজার বছর আগেও এখানে ছিল ভিন্ন মতবাদ ও গোষ্ঠী এবং সামাজিক প্রথার মিলনমেলা। তাই এখানকার মরুভূমিতে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন সভ্যতার হাজারো নিদর্শন। তেমনই এক নিদর্শন সৌদি আরবের মরুভূমির বুকে দাঁড়িয়ে থাকা স্থাপত্য কাসর আল-ফরিদ, যার আক্ষরিক অর্থ নিঃসঙ্গা দুর্গ। অনেকে আল-হেজার বলেও ডেকে থাকেন।

মূল আরব মরুভূমি ইয়েমেন থেকে পারস্য উপসাগর আর ওমান থেকে জর্ডন ও ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত। মরুভূমিটি আরব উপদ্বীপের বেশিরভাগ এলাকা দখল করে আছে, যার মোট আয়তন ২৩,৩০,০০০ বর্গকিলোমিটার। এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মরুভূমি এবং এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। এরই উত্তরে সৌদি আরবের অংশে জনমানবের কোনো চিহ্ন নেই। এমনই এক স্থানে বিশাল এক পাথর খোদাই করে তৈরি হয়েছিল রহস্যময় এই স্থাপত্য।

সামনে থেকে দেখলে মনে হবে, এটি অতিকায় আকৃতির পাথর। কিন্তু এই পাথরখণ্ডেরই অন্য পাশে রয়েছে আসল সৌন্দর্য। পাথরের ওপর অসম্ভব দক্ষ হাতের কারুকাজ, যা দেখলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। বিশাল

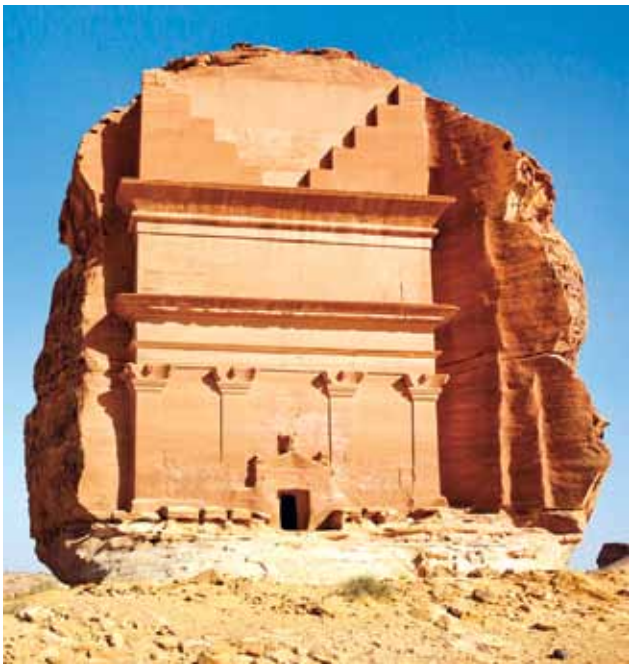

কাসর আল-ফরিদের সম্মুখভাগ।

এই পাথরখণ্ডের প্রতিটি ফটকে রয়েছে সুনিপুণ হাতের ছোঁয়া। এবং এর বিশালত্ব দেখে হতবাক ভ্রমণকারীর মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, জনমানবহীন স্থানে এমন অতিকায় স্থাপত্য কারা তৈরি করেছিল এবং কেন?

এর উত্তর রয়েছে দূর-অতীতে, খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে। সেই সময়টিতে ছিল নাবাতিয়ান নামক এক শক্তিশালী গোষ্ঠীর আধিপত্য। নাবাতিয়ানরা ছিলেন জাতিতে আরব। নিজেদের এরা বলতেন আল-আনবাত। অসম্ভব প্রতিভাধর এবং পরিশ্রমী জাতি। যে-সাম্রাজ্য তাঁরা তৈরি করেছিলেন, সেটির অবস্থানগত গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। জায়গাটির নাম ছিল রাকমু, যাকে আমরা আজ পেট্রা নামে চিনি। আরব উপদ্বীপ, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, মিশরের যাতায়াতের পথে। আশপাশের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক পথও হয়ে দাঁড়ায় এই পেট্রা নগরী। ফলে ওইসব এলাকায় তাঁদের বাণিজ্যিক কর্তৃত্ব অটুট রাখতে পেরেছিলেন দীর্ঘদিন। ক্রমে রাকমু বা পেট্রা হয়ে ওঠে নাবাতিয়ান সাম্রাজ্যের রাজধানী, যে-অঞ্চলটি বর্তমানে জর্ডনের অংশ। অবস্থানগত সুবিধায় পেট্রা খুব অল্প সময়ের মধ্যে অন্যতম বাণিজ্যনগরীও হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, প্রকৌশল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে দক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। এসব খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের কথা।

নাবাতিয়ানদের হাতের কাজ ছিল অসাধারণ। বিশাল বিশাল পাথর খোদাই করে তাঁরা অনন্য স্থাপত্য তৈরি করতে পারতেন। সেগুলো আজও টিকে আছে। বিশাল বড়ো বড়ো পাথরের ওপর অতি অল্প সময়ের মধ্যে খোদাই করে এক অপরূপ সুন্দর নির্মাণশৈলী উপস্থাপন করতে পারতেন এই নাবাতিয়ানরা। ধীরে ধীরে অতিকায় বেলেপাথরের পাহাড় কেটে বাড়িঘর বা প্রাসাদ তৈরি করতে থাকলেন তাঁরা।

তাই বিভিন্ন শক্তিশালী দেশের রোষানলে পড়তে থাকে পেট্রা নগরী। ১০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে রোমান সম্রাট ট্র্যাজান দখল করে নেন পেট্রা নগরী। এরপর ধীরে ধীরে গ্রিকোরোমান সংস্কৃতির চাপে হারিয়ে যেতে থাকে নাবাতিয়ান সভ্যতার কীর্তি।

কাসর আল-ফরিদ পেট্রা থেকে দক্ষিণে। সৌদি আরবের এই এলাকাটির নাম মাদাইন সালিহ। এখানে চুরানব্বইটি স্থাপত্য রয়েছে। এগুলো থেকে দূরে, একা দাঁড়িয়ে আছে কাসর আল-ফরিদ।

অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকের মতে, এটি একটি সমাধিসৌধ। এই এলাকার অন্যান্য স্থাপত্যের মধ্যে রয়েছে কাসর আল-বিন্ত, কাসর আল-সানি এবং জাবালে আল-মাহজার। কিন্তু আয়তন, দেয়ালের কাজ, স্তম্ভের সংখ্যা ও উচ্চতায় কাসর আল-ফরিদ অন্যান্য স্তম্ভ হতে আলাদা। অন্যান্য সমাধিগুলোর সদরের বহির্ভাগে দুটি স্তম্ভ চোখে পড়ে, যেখানে চারতলাবিশিষ্ট কাসর আল-ফরিদে রয়েছে চারটি স্তম্ভ। তাই প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা, যিনি এই সমাধিক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন, তিনি নাবাতিয়ানদের মধ্যে বিশেষ প্রাচুর্য ও বংশগৌরবের অধিকারী ছিলেন। তবে অনেক গবেষকের মতে, কাসর আল-ফরিদ বস্তুত অসম্পূর্ণ একটি শিল্পকর্ম। দুর্গটির চারপাশ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এর ওপরের দিকের কাজ অনেকটা গোছানো এবং দৃষ্টিনন্দন। কিন্তু এর নীচের দিকের কাজ অনেকটাই রুক্ষ এবং অমসৃণ। ফলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা, দুর্গটির নীচের অংশের কাজ ঠিকভাবে শেষ করা হয়নি। কেনই-বা এই কবরটি মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার উত্তর এখনও জানা সম্ভব হয়নি। এমনও হতে পারে, এর নির্মাণশিল্পীরা স্থাপত্যটিকে এমনভাবেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

দু-হাজার বছর ধরে কী করে একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বিশাল স্থাপত্যটি? প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, মরুভূমির বাতাসে জলীয় বাষ্পের স্বল্পতা এবং প্রচণ্ড তাপের কারণেই এখানকার স্থাপত্যগুলো এখনও অক্ষত রয়ে গেছে। এবং এখনও বিভিন্ন পর্যটককে অপার বিস্ময়ে বিস্মিত করে। তাই প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে পর্যটকদের সমাগম। ২০০৮ সালের দিকে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এই পাথুরে দুর্গগুলোকে। সেই থেকে এটি সৌদি আরবের সর্বপ্রথম কোনো স্বীকৃত স্থান, যা বিশ্বের একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ■

কাসর আল-ফরিদের পশ্চাদ্ভাগ।

এটি নানান টুকরো টুকরো বিভাগের সমন্বয়। ভাষা, দেশ, বই, মহাকাশ— কী নেই! রত্নে ভরা আলিবাবার গুহা যেন।

দেশ

তুরস্ক

নাম প্রজাতন্ত্রী তুরস্ক বা ত্যুর্কিয়ে জুম্হুরিয়তে। পৃথিবীর মানচিত্রে দেখা যাবে দেশটির অবস্থানে একটি বিশেষত্ব আছে। তুরস্ক এমন একটি দেশ, যা এশিয়া ও ইউরোপ দুই মহাদেশেই ছড়িয়ে আছে। তাই একে ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল কান্ট্রি বা আন্তঃমহাদেশীয় দেশ বলে। তুরস্কের ৯৭ শতাংশ অংশ এশিয়া মহাদেশে ও মাত্র ৩ শতাংশ অংশ ইউরোপে। এশীয় অঞ্চলকে বলা হয় আনাতোলিয়া বা এশিয়া মাইনর এবং ইউরোপীয় অংশকে বলে থ্রাস। তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা আনাতোলিয়াতে অবস্থিত। যদিও ইউরোপীয় অংশে থাকা শহরে ইস্তানবুল তুরস্কের সবচেয়ে বড়ো শহর এবং বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

তুরস্কের আয়তন ৭,৮৩,৩৫৬ বর্গকিমি। আয়তনের নিরিখে তুরস্ক বিশ্বের ৩৭-তম, জনসংখ্যা ৭ কোটি ৯৬ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬৬৩ জন। বিশ্বের মধ্যে ১৮-তম জনবহুল দেশ তুরস্ক। তবে জনঘনত্বের নিরিখে দেশটি পৃথিবীতে ১০৭-তম। প্রতি বর্গকিমিতে মাত্র ১০২ জন লোক বাস করেন। এ-দেশের মুদ্রার নাম টার্কিস লিরা।

তুরস্ক দেশটি চতুর্ভুজাকৃতি। তিন দিক থেকে সমুদ্রে ঘেরা। তাই একে উপদ্বীপ বা পেনিনসুলা বলা হয়। দেশটির পশ্চিমে রয়েছে ইজিয়ান সাগর, উত্তরে ব্ল্যাক সি বা কৃষ্ণসাগর এবং দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর। তিনটি জলপথ তুরস্কের এশীয় ও ইউরোপীয় অংশকে আলাদা করেছে। এরা হল— বসফরাস প্রণালী, মার্যারা উপসাগর ও দার্দানেল প্রণালী। এই জলপথ তিনটি একত্র হয়ে গঠন করেছে তুরস্ক প্রণালী, যা কৃষ্ণসাগর থেকে ইজিয়ান সাগরে প্রবেশের একমাত্র পথ।

তুরস্কের পশ্চিমে ইজিয়ান সাগর ও গ্রিস, উত্তর-পূর্বে জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও স্বায়ত্তশাসিত আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র নাখচিভান, পূর্বে ইরান, দক্ষিণে ইরাক সিরিয়া ও ভূমধ্যসাগর। উত্তর ভাগে রয়েছে কৃষ্ণসাগর।

তুরস্কের ইতিহাস দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল। প্রাচীন সময় থেকে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মানুষ এলাকাটি দখল করেছে। গোবেকি তেপে (Gobeki-Tepe) নামক দক্ষিণ-পূর্ব আনাতোলিয়ার একটি স্থানে পৃথিবীর প্রাচীনতম মনুষ্যনির্মিত উপাসনালয় পাওয়া গেছে। যার আনুমানিক বয়স ১০০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। নব্যপ্রস্তর ও তাম্র যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। যা প্রায় ৭০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পুরোনো। ২০১২-তে ইউনেস্কো এই স্থানটিকে World Heritage Site ঘোষণা করেছে। ইলিয়ড মহাকাব্যে যে ট্রয় নগরীর যুদ্ধ ও তার ধ্বংসের গাথা পাওয়া যায়, সেই নগরী এশিয়া মাইনর বা আনাতোলিয়ায় গড়ে উঠেছিল লৌহ যুগে।

আনাতেলিয়ার সর্বপ্রাচীন বাসিন্দারা ছিল হাট্টিয়ান ও হুরিয়ানরা। ২৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এদের বসতি ছিল মধ্য ও পূর্ব আনাতোলিয়ায়। ২০০০ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মাঝে কোনো এক সময়ে এই অঞ্চলগুলি দখল করে হিট্টাহিটরা। ১৯৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ আসিরীয়রা দক্ষিণ-পূর্ব আনাতোলিয়া দখল করে এবং প্রায় ৬১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত যাদের সাম্রাজ্য টিকে থাকে। এরপর সময়ান্তরে ফ্রিজীয়, সিমেরিয়ান, মেদেস বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আনাতোলিয়া শাসন করে। ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ আনাতোলিয়ার সমুদ্রতীরগুলোতে ব্যাপক পরিমাণে আয়োলিয়ান ও আয়োনিয়ান গ্রিকদের বসতি গড়ে ওঠে। গ্রিকরা এসময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর গড়ে তোলে। যেমন— মিলেতুস, এফেসুস, স্মিরনা, বাইজেনটিয়াম। এই বাইজেনটিয়াম শহরটি বর্তমানে ইস্তানবুল নামে পরিচিত। ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের আকামেনেদীয় সম্রাটরা আনাতোলিয়ার বিস্তৃত অংশ জয় করে। এবং এই সময় সমুদ্রতীরবর্তী নগররাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে তাদের সংঘাত শুরু হয়।

৩৩৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার পারসিকদের পরাজিত করে। এবং সমগ্র আনাতোলিয়ায় গ্রিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। গ্রিক সংস্কৃতির এই অনুপ্রবেশে কালক্রমে আনাতোলিয়ার মানুষজন নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতি ভুলে যায়। খ্রিস্টপূর্বাব্দ প্রথম শতকে আনাতোলিয়া রোমান সাম্রাজ্যের অধীন চলে যায়। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে পাওয়া যায় তুরস্কের Anitoch বা বর্তমান Antakya নামক স্থানটিতে প্রথম খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়টি গড়ে ওঠে। ৩২৪ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট প্রথম কনস্ট্যানটাইন বাইজানটিয়ামকে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ও খ্রিস্ট ধর্মকে জাতীয় ধর্ম ঘোষণা করেন। পরবর্তী সময় অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য রোম সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় বাইজানটিয়াম। সম্রাট কনস্ট্যানস্টাইনের নামানুসারে এই শহরটির নতুন নাম হয় কনস্ট্যান্টিনোপল। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য হিসেবে। ১০৭১ সালে মানজিকার্তের যুদ্ধে বাইজানটিনীয়রা সেলজুক তুর্কিদের কাছে পরাজিত হয়। সেলজুক তুর্কিরা ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী, এরাই বর্তমান তুরস্কের অধিবাসীদের আদি পূর্বপুরুষ। ১২৪৩ সালে মোঙ্গল আক্রমণের মুখে সেলজুক তুর্কিরা পরাজিত হয়। ১৩ শতকের শেষ দিকে আনাতোলিয়ায় অটোমান বা উসমানীয় সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। ১৪৫৩ সালে অটোমান তুর্কিরা কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করে এবং সম্পূর্ণরূপে আনাতোলিয়াকে করায়ত্ত করে। অটোমান সাম্রাজ্য প্রায় ৬০০ বছর তুরস্ক শাসন করে এবং আনাতোলিয়া ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। সতেরো শতাব্দীতে এই সাম্রাজ্যের অধীনে ৩৬-টি প্রদেশ ও বেশ কিছু অনুগত রাজ্য ছিল। অটোমান সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় সামরিক ক্ষমতায় পিছিয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশ অটোমানদের হাতছাড়া হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের হারের ফলে অটোমান সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। আনাতোলিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব থ্রাস নিয়ে আধুনিক তুরস্কের জন্ম হয়। বলকান ও মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত সাম্রাজ্যের অংশগুলি ৪২-টি নতুন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯১৪ সালে তুরস্ক অক্ষশক্তির হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় ও পরাজিত হয়। মূলত নিজেদের ভৌগলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তুরস্ক এই যুদ্ধে অংশ নেয়। যুদ্ধে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টে তুর্কি বাহিনী নিয়োজিত ছিল। ফ্রন্ট চারটি হল— দার্দানেলিস, সিনাই-প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া ও পূর্ব আনাতোলিয়া। যুদ্ধের শেষের দিকে প্রতিটি ফ্রন্টেই তুর্কি বাহিনী পরাজিত হয়। সুতরাং তুরস্কের পক্ষে

আধুনিক তুরস্কের জনক মোস্তাফা কেমাল আতাতুর্ক।

যুদ্ধবিরতি ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। ১৯১৮ সালের ৩১ অক্টোবর তুর্কি ও ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা লেমনস দ্বীপের সমুদ্রবন্দরে ব্রিটিশি নৌবাহিনীর আগামেমনন যুদ্ধজাহাজে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

১৯২৩ সালের উসমানীয় তুর্কিভাষী এলাকা আনাতোলিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব থ্রাস নিয়ে গড়ে ওঠে আধুনিক তুরস্ক। আধুনিক তুরস্কের রূপকার যে-মানুষটি, তাঁর নাম মোস্তাফা কেমাল আতাতুর্ক। তাঁকে আধুনিক তুরস্কের জনক বলা হয়। আতাতুর্ক তাঁর উপাধি, যা দেশের জনগণ দিয়েছিল। আতাতুর্ক শব্দের অর্থ তুর্কিদের পিতা। তিনি ছিলেন তুরস্কের প্রথম রাষ্ট্রপতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আতাতুর্ক ছিলেন অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে একজন সামরিক কর্মকর্তা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয় বা অটোমান সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পর তিনি তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে তুর্কি জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। আঙ্কারায় একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গড়ে তোলেন এবং মিত্রবাহিনীর প্রেরিত বাহিনীকে হারিয়ে দেন।

নবগঠিত তুরস্ক রাষ্ট্রটিকে গড়ে তুলতে মোস্তাফা কেমাল কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। যার জন্য সমসাময়িক তুরস্কে তিনি ভয়ংকরভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রাণনাশের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল। অটোমান সম্রাটরা নিজেদের খলিফা ঘোষণা করেছিলেন। খলিফা হলেন মুসলমানবিশ্বের প্রধান পুরুষ ও সর্বোচ্চ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। আতাতুর্ক ক্ষমতায় এসে খিলাফত প্রথা রদ করেন। যা নিয়ে সারা মুসলমানবিশ্বে, এমনকী তুরস্কেও সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। তুরস্ককে তিনি একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করেন এবং স্পষ্টভাবে বলা হয় ধর্মচর্চা নিজের ব্যক্তিঅনুভূতির ব্যাপার এবং রাজনৈতিক দলগুলির ধর্মীয় বিষয় এড়িয়ে চলা উচিত। আতাতুর্কের সরকারের মূল নীতিগুলি কেমালবাদ নামে পরিচিত হয় এবং এই মূলনীতিগুলির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ভবিষ্যতের তুরস্ক।

মোস্তাফা কেমাল তুরস্কের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের জন্য আমেরিকান শিক্ষা সংস্কারক জন ডিউইকে আঙ্কারায় আমন্ত্রণ জানান। গণসাক্ষরতাকে রাষ্ট্রের অন্যতম কর্মসূচি স্থির করা হয়। ১৯২৫ সালে মোস্তাফা কেমাল তুর্কিদের আধুনিক ইউরোপীয় পোশাক পরতে উৎসাহ দেন। সরকারি চাকুরেদের জন্য হ্যাটকে বাধ্যতামূলক করেন। জনগণকে আরও উৎসাহিত করার জন্য ১৯২৫ সালে এক জনসমাগমে তিনি সবার সামনে পানামা হ্যাট মাথায় পরেন। পোশাক সংস্কারের সর্বশেষ ধাপ ছিল পাগড়ির মতো ধর্মভিত্তিক পোশাকের পরিবর্তে পশ্চিমা স্যুট ও নেকটাইয়ের সঙ্গে হ্যাট পরিধানের নির্দেশিকা। মোস্তাফা কেমাল মনে করতেন পোশাক, রুচি সমস্ত দিক থেকে তুরস্ককে ইউরোপীয় হয়ে উঠতে হবে, তবেই ইউরোপের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তুরস্ক টক্কর দিতে পারবে। মহিলাদের পোশাক কেমন হওয়া উচিত, এ-বিষয়ে তিনি মতামত দেননি। বিভিন্ন আলোকচিত্রে তাঁকে তাঁর স্ত্রী লতিফা উশকগিলের সঙ্গে একসঙ্গে দেখা যায়। দেখা যায় তাঁর স্ত্রীর মাথা ইসলামি রীতি অনুযায়ী ঢাকা। কেমালের লেখায় পাই: "নারীদের ধর্মীয় মতে আবৃতকরণ সমস্যার সৃষ্টি করে না। মাথা ঢেকে রাখার এই রীতি আমাদের সমাজে মূল্যবোধ ও রীতিবিরুদ্ধ নয়।"

২ সেপ্টেম্বর দেশের সকল সুফি কার্যক্রম ও খানকাগুলি বন্ধের আদেশ দেন। ১৯২৮ সালের বসন্তে কেমাল তুরস্কের কয়েক জন ভাষাবিদ ও অধ্যাপকের সঙ্গে বৈঠক করেন। ঠিক করা হয় যে, তুর্কি ভাষা লেখার জন্য আরবি বর্ণমালার পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণমালা ব্যবহার করা হবে। ল্যাটিন বর্ণমালা অর্থাৎ যে-বর্ণমালায় ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষা লেখা হয়। ১৯২৮ সালের ১ নভেম্বর ল্যাটিন হরফে লেখা নতুন তুর্কি বর্ণমালা চালু হয়। এই সংস্কারের আগে আরবি হরফে সম্পূর্ণ তুর্কি বর্ণমালা আয়ত্ত করতে শিক্ষার্থীর তিন বছর সময় লেগে যেত। নতুন বর্ণমালা ব্যবহারের পূর্বে তুরস্কে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১০ শতাংশ। দুই বছরের মধ্যেই তা ৭০ শতাংশে পৌঁছে যায়।

তুরস্কের আইনব্যবস্থাতে তিনি ইসলামি আইনব্যবস্থার বদলে ইউরোপীয় আইনব্যবস্থার সূচনা করেন। Turkish Civil Code তৈরি হয়। এটি সুইৎজারল্যান্ড, জার্মান, ফ্রান্স ও ইতালি বিভিন্ন দেশের আইনের সংমিশ্রণে গঠিত। ১৯৩৮ সালে এই মহান দেশনেতার মৃত্যু হয়।

১৯৫০-এর দশক থেকে রাজনীতিতে ধর্মের ভূমিকা তুরস্কের একটি বিতর্কিত বিষয়। তুরস্কের সামরিক বাহিনী নিজেদের কেমালবাদের রক্ষী মনে করে। তারা ১৯৬০, ১৯৭১, ১৯৮০ ও ১৯৯৭ সালে মোট চার বার তুরস্কের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার সাপেক্ষে হস্তক্ষেপ করেছে। ২০১৬ সালেও একটি সেনা অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হয়েছিল। একে কঠোরভাবে দমন করেন তুরস্কের বর্তমান রাষ্ট্রপতি রিসেপ তায়িপ এরদোগান।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুরস্ক বেশ শক্তিধর দেশ। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তুরস্ক। এ ছাড়া OECD, OIC, ECO, BSEC, D-8, G-20 বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দেশগুলির সংগঠনের সদস্য তুরস্ক। ২০০৮ সালের ১৭ অক্টোবর তুরস্ক ১৫১-টি দেশের সমর্থন পেয়ে জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়। বহুদিন ধরে তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু এখনও সফলতা আসেনি। NATO-ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে তুরস্কের প্রতিরক্ষা বাহিনী দ্বিতীয় বৃহত্তম। ১৯৫২ সালে তুরস্ক NATO-তে যোগ দেয়। ন্যাটোভুক্ত যে পাঁচটি দেশ যৌথ পরমাণু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তুরস্ক তাদের অন্যতম।

তুর্কি ভাষা তুরস্কের সরকারি ভাষা। এখানকার প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ তুর্কি ভাষাতে কথা বলে। এ ছাড়া আরও প্রায় ৩০-টি ভাষা প্রচলিত। এদের মধ্যে আরবি, আর্মেনীয়, আজারবাইজানি, জর্জীয়, কুর্দি উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে ইংরেজি ব্যবহার করা হয়। বর্তমান তুরস্ক একটি সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, যার কোনো রাষ্ট্রধর্ম নেই এবং প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে পরিসংখ্যান অনুযায়ী তুরস্কের ৯৬.৫ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। ০.৩ শতাংশ খ্রিস্টান ও ৩.২ শতাংশ

বিখ্যাত হাজিয়া সোফিয়া। ইস্তানবুল।

অন্যান্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। জনজাতির দিক থেকে দেখলে ৭০-৮০ শতাংশ মানুষ তুর্কি জনজাতির অন্তর্ভুক্ত। ২০ শতাংশ মানুষ কুর্দ। এ ছাড়া সারকাসিয়ান, আলবানিয়ান, আরব, বসানিক, লাজ বিভিন্ন জনজাতির মানুষ এখানে বাস করে। তুরস্ককে সাতটি ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। দেশটির ভূমিরূপ বিচিত্র, দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমে আছে উর্বর সমভূমি। পশ্চিমে উঁচু অনুর্বর মালভূমি। দেশের অভ্যন্তরের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন হলেও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ু মৃদু। তুরস্কে বেশ কিছু আগ্নেয় পর্বত আছে এবং তাদের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে তুরস্কে মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হয়, তুরস্কে প্রায় ৪০-টি জাতীয় পার্ক আছে। এবং ৮০-টির মতো বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। মাউন্ট নেমরুদ ন্যাশনাল পার্কে সারাপৃথিবী থেকে পর্যটকরা আসেন। তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা বিখ্যাত আঙ্গোরা বিড়াল, আঙ্গোরা খরগোশ ও আঙ্গোরা ছাগলের জন্য। পণ্ডিতদের একাংশের মতে এই আঙ্গোরা থেকেই আঙ্কারা নামটি এসেছে। ইজিয়ান ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের জলবায়ুকে উষ্ণ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল বলা হয়। কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে সারাবছর বৃষ্টি হয়। মার্মাকা উপসাগর ও কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে প্রতি শীতে তুষারপাত হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই তুষার গলে যায়। কিন্তু আনাতোলিয়ার মালভূমি অঞ্চলে শীত খুব দুঃসহ। পূর্ব আনাতোলিয়ায় শীতকালে তাপমাত্রা নেমে যায় -30°C থেকে -40°C-তে। এই অঞ্চল বছরের মধ্যে প্রায় চার মাস বরফেই ঢাকা থাকে। পশ্চিম আনাতোলিয়ায় আবহাওয়া অনেক আরামপ্রদ। শীতকালে গড় তাপমাত্রা থাকে প্রায় -1°C ও গ্রীষ্মে 30°C। বহু শতাব্দী ধরে তুরস্ক ছিল মূলত কৃষিপ্রধান। বর্তমানে কৃষিখামার তুরস্কের অর্থনীতির একটি বড়ো অংশ। দেশের ৩০ শতাংশ মানুষ এই কাজে নিয়োজিত। পৃথিবীর প্রায় ৮০ শতাংশ আখরোট তুরস্কে উৎপন্ন হব। তুরস্ক চা উৎপাদনে পৃথিবীর প্রথম পাঁচটি দেশের মধ্যে রয়েছে। এখানকার বেশিরভাগ মানুষ দিনে প্রায় দশ বার চা পান করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কে শিল্পের ব্যাপক প্রসার হয়েছে। বিশেষত অর্থসংস্থান, পরিবহণ, টেক্সাইল ও বস্ত্র-শিল্পে। দেশের আর্থিক সংস্থানের একটি বড়ো অংশ আসে পর্যটন শিল্প থেকে। সারাপৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ ট্যুরিস্ট প্রতিবছর তুরস্কে আসে। তুরস্কে গ্রামীণ সমাজ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। দেশের ৭০.৫ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করে। ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যার নিরিখে তুরস্ক বিশ্বে তৃতীয়। এশিয়া-ইউরোপের সংগমস্থলে অবস্থিত বলে তুরস্কের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তনে বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে। তুর্কি, আনাতোলীয়, অটোমান এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারক তুরস্কের স্থাপত্য, চারুকলা, সংগীত সাহিত্য, চলচ্চিত্র। মহান কবি ও ধর্মতত্ত্ববিদ জালালউদ্দীন রুমির শেষ জীবন কেটেছিল তুরস্কের কোনিয়া প্রদেশে। জালালউদ্দীনের অনুগামীরা মওলায়িআ তরিকার সুফি হিসেবে পরিচিত। সেমা নামক সুফি অনুষ্ঠানে সুফি দরবেশরা গোল হয়ে বনবন করে ঈশ্বরের নামে আত্মহারা হয়ে নাচতে থাকেন। এঁদের পরনে থাকে ঘাগরার মতো দুধসাদা পোশাক, এঁদের Whirling Perviah বলে বা ঘুরন্ত দরবেশ বলে। UNESCO একে Intangible Cultural Heritage list-এ রেখেছে। চিত্রশিল্পে তুরস্কের বিখ্যাত দুই শিল্পী ওসমান হামিদা ও হালিল পাশা। তুরস্কের মিনিয়েচার পেন্টিং ও পেপার মার্বেলিং শিল্প পৃথিবীবিখ্যাত। এ-দেশের সাহিত্যিক ওরহান পামুক ২০০৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। চলচ্চিত্রকার নুরি সেহ্‌লান কান চলচ্চিত্র উৎসবে ২০১৪ সালে Winter Sleep চলচ্চিত্রের জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার পাম দি ওর (Palme d'or) পেয়েছেন। এ-দেশের কবি নাজিম হিকমত আজ এক ভুবনবিদিত নাম।

স্থাপত্যের মধ্যে তিনটি নিদর্শন দেখতে গোটা পৃথিবী থেকে লোক উপচে পড়ে। ইস্তানবুলের হাজিয়া সোফিয়া, ব্লু-মস্ক বা সুলতান আহমেদ মসজিদ ও অটোমান শাসকদের আবাসস্থল তোপকাপি প্রাসাদ।

হাজিয়া সোফিয়া বাইজানটাইন সভ্যতার সময়কার একটি বিখ্যাত গির্জা ছিল। এটি ইস্তানবুল শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। অটোমান তুর্কিরা কনস্ট্যান্টিনোপল বা ইস্তানবুল জয়ের পর এটিকে একটি মসজিদে রূপান্তরিত করে। মসজিদে রূপান্তরের পর দেয়ালে মার্বেল পাথরে আঁকা যিশুর অনেকগুলি ছবি সিমেন্ট দিয়ে মুছে দেওয়া হয়। ৫০০ বছর ছবিগুলি সিমেন্টের আড়ালে চাপ পড়ে ছিল। পরে এই মসজিদটিকে ১৯৩৫ সালে একটি জাদুঘরে পরিণত করা হয়। এবং যিশুখ্রিস্টের ছবিগুলো পুনরুদ্ধার করা হয়। বর্তমানে এই মিউজিয়ামের হলরুমটা ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করা দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু এই স্থাপনায় ইসলাম ও খ্রিস্ট উভয় ধর্মের জন্য আলাদা সংরক্ষিত জায়গা রয়েছে। কমপ্লেক্সটিতে একটি মসজিদ ও একটি গির্জা নির্মাণ করা হয়েছে।

ব্লু-মস্ক বা সুলতান আহমেদ মসজিদটিও ইস্তানবুলের একটি ঐতিহাসিক মসজিদ। মসজিদের ভেতরের দেয়াল নীল রঙের টাইলস দিয়ে সুসজ্জিত বলে এই মসজিদটিকে ব্লু-মস্ক বা নীল মসজিদ বলে। ১৬০৯ থেকে ১৬১৬ সালের মধ্যে অটোমান সম্রাট সুলতান আহমেদ বখতি এটি নির্মাণ করেন। মসজিদ কমপ্লেক্সে একটি মাদ্রাসা, পান্থনিবাস ও প্রতিষ্ঠাতার সমাধি রয়েছে। রাতের বেলা মসজিদের মিনার ও গম্বুজগুলি থেকে আসা আলো নীল টাইলসে বিচ্ছুরিত হয়ে মসজিদের ভিতরে এক মায়াবী নীল আলোর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

তোপকাপি প্রাসাদ ইস্তানবুল শহরে অবস্থিত একটি রাজকীয় প্রাসাদ। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অটোমান সম্রাট দ্বিতীয় মুহাম্মদ এই প্রাসাদের নির্মাণকার্য শুরু করেন। এই প্রাসাদ প্রায় ৪০০ বছর (১৪৬৫—১৮৫৬) অটোমান সুলতানদের বাসস্থান ছিল। এখানে রয়েছে মুসলমানদের জন্য পবিত্র স্মরণচিহ্ন, যেমন হজরত মহম্মদ (স.)-এর আলখাল্লা ও তরবারি। ১৯৮৫-তে ইউনেস্কো একে World Heritage Site ঘোষণা করেছে।

ইস্তানবুলের গ্র্যান্ড বাজার পৃথিবীর অন্যতম একটি বড়ো বাজার। কলকাতার নিউ মার্কেটের মতো বিশাল বড়ো একটি বাড়ির ভিতরে এই বাজারটি বসে। এটি বিশ্বের বৃহত্তম ও প্রাচনীতম Covered Market, অর্থাৎ যে-বাজারটি ঘরের ভিতর ছাদের নীচে অবস্থিত। এই বাজারে ৪০০০-টি দোকান আছে এবং ৬১-টি গলিপথ আছে। প্রতিদিন এখানে ২ লক্ষ ৫০ হাজার থেকে ৪ লক্ষ ক্রেতা ভিড় করে। কনস্ট্যান্টিনোপল জয়ের পর ১৪৫৫-১৪৫৬ সাল নাগাদ এই বাজার নির্মাণ শুরু করেন অটোমান শাসকরা। ১৪৬০ সালের

তোপকাপি প্রাসাদ। ইস্তানবুল।

মধ্যে এর নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়।

তুরস্কের আরও কিছু স্থান, যেখানে পর্যটকরা ভিড় জমান। সেগুলি হল— ব্যাসিলিকা সিসটার্ন, হিপোড্রোম অফ কনস্ট্যানস্টাইন, বসফরাস ইত্যাদি।

শেষ করার আগে একটি মজার তথ্য দিই। উত্তর তুরস্কের কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্তী একটি অঞ্চল Canakci জেলার গিরুসান প্রদেশ। এই অঞ্চলের প্রায় ১০০০০ মানুষ পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের শিসের মাধ্যমে মনের ভাব বিনিময় করে। শিসের সুরের মাত্রার তারতম্যে বিভিন্ন শব্দে মনের ভাবকে বোঝায়। এই ভাষা তাদের পিতামহ-প্রপিতামহের আমল থেকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসছে। এই ভাষা প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো। একে বলা হয়েছে Bird Language। UNESCO একে List of intangible cultural heritage হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

তুরস্কের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল। ফুটবলে তাদের সর্বোচ্চ সাফল্য ২০০২ সালে জাপান-দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান অর্জন। সর্বশেষ সাফল্য তুরস্কের ২০০৮ সালের ইউরো কাপের সেমিফাইনালে ওঠা। অন্যান্য খেলার মধ্যে বাস্কেটবল ও ভলিবল খেলা খুব জনপ্রিয়। ২০০১ সালের ইউরো বাস্কেটবলের আয়োজক দেশ ছিল তুরস্ক। ওই টুর্নামেন্টে তুরস্ক দল দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। তুরস্কের জাতীয় খেলা ঐতিহ্যবাহী ইয়াগুলি গুরেস বা অয়েলড রেসলিং। অটোমানদের সময় থেকেই এই খেলাকে জাতীয় খেলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মোটর রেসিং ও ভারোত্তোলন তুর্কিদের খুব প্রিয়। ভারোত্তোলনে তুর্কিরা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

অতনুমিথুন মণ্ডল

ভাষা

চীনের ভাষা

অন্য বারের মতো কোনো-একটা মাত্র ভাষার পরিচয় এবার দেব না আমরা। বলব এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম রাষ্ট্রের ভাষা নিয়ে দু-চারটে কথা। রাষ্ট্রটির নাম চীন। আর সেটা বলব একটা সহজ কথা বোঝার জন্যে যে, 'এক রাষ্ট্র, এক জাতি, এক ভাষা'র যে-ধারণাটি চালু আছে বিভিন্ন দেশে, সেটা চরম বিভ্রান্তিকর। কোনো কোনো দেশে একটিইমাত্র ভাষা রাষ্ট্র বলে বলীয়ান হয়ে অন্য সব ভাষাকে মুছে দিতে চায় এবং এমনভাবে মাথা তুলে দাঁড়ায় যে, আমাদের মনে হয়, দেশটির সমস্ত মানুষ বুঝি ওই ভাষাতেই কথা বলে।

আড়ালের চিত্রটা কিন্তু অন্যরকম। চীনকে বেছে নেওয়ার কারণ এটিই। কোনো-একটা দেশের ভেতর কত রকমের ভাষার জনগোষ্ঠী বসবাস করে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চীন। ২০১৭ সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী চীনের জনসংখ্যা ১,৩৭৯,৬৬৫,০০০ জন। অর্থাৎ সাদা বাংলায় ১৩৭ কোটি ৯৬ লক্ষ ৬৫ হাজার। ২০১৮-য় এসে অনায়াসে বলা যায়— সংখ্যাটা ১৩৮ কোটি।

এই বিপুল সংখ্যক মানুষ কোন বা কোন কোন ভাষায় কথা বলে? চীনের সরকারি ভাষা কোনটি? সে-দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা কী?

আমরা জানি, যাকে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বলে, অর্থাৎ সরকারি ভাষা, চীনের ক্ষেত্রে সেটা মান্দারিন। কেন? ২০১০ সালের একটি সংস্করণে ন্যাশনাল এনসাইক্লোপেডিন জানাচ্ছে, চীনের মোট জনসংখ্যার ৭১ শতাংশ মানুষ মান্দারিন চীনায় কথা বলে। সে-দেশের বড়ো অংশের মানুষেরা যে প্রামাণ্য কথ্য ভাষা বলে, তার নাম হ্যাতংগিংফা (চীনা উচ্চারণের কাছাকাছি পৌঁছোনো বাঙালি জিভের পক্ষে দুঃসাধ্য কাজ। না হলে Putonghua-র উচ্চারণ গুগল কেন বার বার শুনিয়েই যাচ্ছে— হ্যাতংগিংফা!)। এবং সেটা মান্দারিন চীনারই একটা রূপ। এই হ্যাতংগিংফাই চীনের মূল ভূখণ্ডের, অর্থাৎ যেটাকে বলে মেন ল্যান্ড চায়না, যে-অঞ্চলের ভাষা মান্দারিন, সরকারিভাবে জাতীয় কথ্য ভাষা। এই ভাষাটিই চীনের বৃহত্তম অংশে লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা হিসেবে গ্রহণীয় হয়েছে অর্থাৎ এটিই আমজনতার প্রচলিত ভাষা। আর তাই মান্দারিন হতে পেরেছে চীনের রাষ্ট্রভাষা।

কিন্তু আর-কোনো ভাষা কি নেই চীনে? আছে। এবং সেসব ভাষার সংখ্যাও কম নয়। বরং অন্য দেশের চেয়ে ঢের বেশিই বর্ণময় সে-দেশের ভাষাচিত্র।

চীনের মানুষ মোট ২৯৯-টি ভাষায় কথা বলে। এদের প্রত্যেকটিই, যাকে বলে জীবিত ভাষা। এবং নথিভুক্ত। এগুলোর মধ্যে ২৭৫-টি ভাষা উপজাতিদের, ২৪-টি ভাষায় কথা বলে অনুপজাতিরা। আর-একটু ভেতরে ঢুকলে দেখতে পাব, ১৪-টি ভাষার প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২৩-টি উদীয়মান। ১০৪-টি ভাষা তুলনামূলকভাবে জোরালো। ১২৬-টি ভাষা ভুগছে অস্তিত্বের সংকটে। এবং মরে যাচ্ছে ৩২-টি ভাষা।

সবচেয়ে প্রভাবশালী ভাষা হান। একে প্রশাসনিক সুবিধের জন্যে চীনা সরকার সাতটি ভাগে ভাগ করেছে। এর আবার আটটি প্রাকৃতিক শাখা রয়েছে, যারা পরস্পরের থেকে পৃথক হয়েও বেশ ঘনিষ্ঠ। যেমন ইউরোপীয় ভাষাগুলি— ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান। এ ছাড়া যেসব ভাষার ওপর সরকারি পোষকতা রয়েছে, সেগুলো হল— চীনা, মঙ্গোলীয়, তিব্বতি, উইঘুর এবং ঝুয়াং।

মান্দারিন-সহ চীনের এইসব ভাষা কোন গোত্রভুক্ত?

ভাষাবিজ্ঞানীরা বলছেন, চীনের কথ্য ভাষাগুলো মোট দশটি বৃহত্তর ভাষা-পরিবার থেকে এসেছে। এরা হল— এক— সিনো-টিবেটান পরিবার। সরকারি নথিভুক্ত উনিশটি জনজাতি এই পরিবারভুক্ত ভাষায় কথা বলে, যাদের মধ্যে অতি উল্লেখযোগ্য ভাষা হান (পরে একটু বলব এই ভাষা সম্বন্ধে) আর তিব্বতি ভাষা। দুই— তাই-কাদাই পরিবার। এই পরিবারের বেশ কয়েকটি ভাষা চালু আছে চীনে। যেমন— ঝুয়াং, বউইয়ি,

দোং-সহ মোট ৯-টি সরকারি জনজাতির ভাষা এটি। তিন— মং-মিয়েন পরিবার। তিনটি জনজাতি এই পরিবারভুক্ত ভাষায় কথা বলে। চার— অস্ট্রোএশিয়াটিক পরিবার। ৪-টি জনজাতির মাতৃভাষা এসেছে এই পরিবার থেকে। এই পরিবারেরই একটি ভাষা ভিয়েতনামি। পাঁচ— তুর্কি পরিবার। উইঘুর, কাজাক, সালারস ইত্যাদি সাতটি সরকারি জনজাতির ভাষা। এরা মোটের ওপর পশ্চিম চীনে বসবাস করে। ছয়— মঙ্গোলীয় পরিবার। মঙ্গোল, ডংজিয়াং, এবং সম্পর্কিত গোষ্ঠীর ৬-টি সরকারি জনজাতি এই পরিবারের ভাষাভুক্ত। সাত— টুঙ্গুইজিক পরিবার। মানচু (পূর্বে), হেজে, ইত্যাদি ভাষা এসেছে এখান থেকে। ৫-টি জনজাতির ভাষা। আট— কোরিয়ান পরিবার। কোরিয়ান ভাষা। নয়— ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবার। ২-টি সরকারি জনজাতির ভাষা (রুশ এবং তাজিক আসলে পামির এলাকাবাসী)। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ জিনজিয়াংয়ে ফারসি-প্রভাবিত ভাষাও রয়েছে। দশ— অস্ট্রোনেশীয় পরিবার। মোটের ওপর ১-টি জনজাতির ভাষা— এরা গৌশান। এ ছাড়া একটি বেসরকারি জনজাতিরও ভাষা এটি।

এ তো গেল কথ্য ভাষার কথা। কিন্তু আমরা কি ভেবে দেখেছি, যাদের কোনো ভাষা নেই, কোনো ভাষা শেখার সৌভাগ্য যাদের হয়নি, যারা মূক ও বধির— আজকাল যাদের শ্রবণ-প্রতিবন্ধী বলা হয়, তাদের কথা? হ্যাঁ, পৃথিবীর সব দেশেরই শ্রবণ-প্রতিবন্ধীর কোনো কথ্য ভাষা নেই। তাদের আছে এক আন্তর্জাতিক ভাষা, যা ইঙ্গিতময়। সেই ইঙ্গিতময়তাকেই বিজ্ঞানভিত্তিক সুশৃঙ্খলিত রূপ দিয়ে একটি ভাষা করা হয়েছে, যা চীনের শ্রবণ-প্রতিবন্ধীরা যেমন বলে, তেমনই বলে ভারতের বা পেরুর শ্রবণ-প্রতিবন্ধীরা। চীনে এদের সংখ্যা ২০০৬ সালের হিসেব অনুযায়ী ২ কোটি ৪০ হাজার।

মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর অন্তত ডজন কয়েক দেশের জনসংখ্যা এর চেয়ে কম।

ভারতে এই সংখ্যাটি কত? জানা যায় না। আমাদের জনগণনায় প্রতিবন্ধীদের নানা পরিসংখ্যান থাকলেও সংখ্যার হিসেব কোথাও নেই।

নেহা চৌধুরী

তারায় তারায়

ডেনেবোলা বা উত্তরফাল্গুনী

আজকের তারাটি সম্পর্কে জানার আগে আমরা শুনব গ্রিক বা রোমক পুরাণের একটি গল্প। গ্রিক ও রোমক পুরাণে গল্পগুলোতে সবই এক কিন্তু গল্পের দেব-দেবী, চরিত্রগুলোর নাম আলাদা আলাদা। যেমন গ্রিকরা যাঁকে বলেন হেরাক্লিস, রোমানরা তাঁকে বলেন হারকিউলিস। হারকিউলিস নামটা আমাদের খুবই পরিচিত। কোনো শক্তিশালী লোক দেখলে আমরা তো বলি— লোকটার গায়ের জোর দেখেছ, হারকিউলিসের মতো। যাই হোক, আজ আমাদের গল্প হারকিউলিস বা হেরাক্লিসকে নিয়ে। হেরাক্লিসের খুড়তুতো ভাই ইউরিসথেউস ছিলেন তিরিনস (Tiryns) -এর রাজা। শারীরিকভাবে তিনি ছিলেন দুর্বল। তাই তাঁর মনে ভয় ছিল শক্তিধর হেরাক্লিস তাঁকে যেকোনো মুহূর্তে সিংহাসনচ্যুত করতে পারেন। কিন্তু হেরাক্লিস দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে দেবতাদের সমকক্ষ হলেও মনের দিক থেকে ছিলেন শিশুর মতো সরল, একটু বোকাসোকা। সাংসারিক মারপ্যাঁচ বুঝতেন না। তাঁর রক্তে ছিল অ্যাডভেঞ্চার, রোমাঞ্চের প্রতি টান। যা করার ক্ষমতা অতি বড়ো বীর, শক্তিধর দেবতাদেরও অসাধ্য ছিল, এরকম ১২-টি দুঃসাহসিক কাজের ভার তাঁকে দেন ইউরিসথেউস। উদ্দেশ্য হেরাক্লিসকে রাজ্য থেকে দূরে রাখা ও এই দুঃসাহসিক কাজগুলি করতে গিয়ে হেরাক্লিসের মৃত্যু যদি হত তাহলে তো সোনায় সোহাগা। সিংহাসনের কোনো বিপদ আর রইবে না। এই ১২-টি দুঃসাহসিক কাজের প্রথমটি ছিল নিমিয়ার ভয়ংকর সিংহকে বধ। গ্রিসের পেলোপনেস প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশের একটি ছোটো জনপদ নিমিয়া। এখানে পাহাড়ের গুহাতে বাস করত একটা সিংহ। এই সিংহের গোটা শরীরে ছিল সোনার লোম, তাই কোনো অস্ত্র তার দেহ ভেদ করতে পারত না। থাবার নখগুলি ছিল তরোয়ালের থেকেও শক্ত আর ধারালো। তাই যেকোনো কঠিন বর্মকেও তা ভেদ করে যেতে পারত। এই দুর্দান্ত সিংহের অত্যাচারে জর্জরিত ছিল নিমিয়াবাসী। সিংহটি মহিলাদের অপহরণ করত ও বন্দি করে রাখত। যোদ্ধারা মহিলাদের উদ্ধার করতে গুহায় ঢুকলে দেখতে পেত মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন এক রমণী। তাঁকে উদ্ধার করার জন্য কাছে গেলেই ওই সংজ্ঞাহীন রমণী ভয়ংকর সিংহের রূপ ধারণ করত ও যোদ্ধাদের হত্যা করে খেয়ে ফেলত। শুধু হাড়গুলি ফেলে রাখত পাতালবাসী মৃত্যুর রাজা হেডিসের উদ্দেশে।

হেরাক্লিস প্রথম যখন এই সিংহকে দেখতে পান তখন এই সিংহটিকে লক্ষ করে তির ছুড়তে থাকেন। কিন্তু একটাও তির সিংহের শরীরে প্রবেশ না করে চারিদিকে ছিটকে যায়। এরপর হেরাক্লিস একটা ফন্দি আঁটেন। সিংহটাকে গুহায় প্রবেশ করতে দেন। গুহার প্রবেশদ্বার ছিল দুটি। একটিকে তিনি পাথরচাপা দিয়ে বন্ধ করে দেন এবং অন্যটি দিয়ে গুহায় প্রবেশ করেন। গুহার নিকট কালো অন্ধকারে প্রচণ্ড শক্তিতে সিংহটির মাথায় মুগুর দিয়ে আঘাতে আঘাতে হেরাক্লিস সিংহকে অজ্ঞান করে দেন। তারপর দুই বাহু দিয়ে পিষে সিংহটিকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলেন। এই যুদ্ধে সিংহটিও হেরাক্লিসের হাতের একটি আঙুল ছিঁড়ে নেয়।

নিমিয়া প্রদেশের এই সিংহটিকে গ্রিক বা রোমক পুরাণে নিমিয়ান লায়ন বা নিমিয়ার সিংহ বলা হত। প্রাচীন সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে আলাদা করে কোনো পার্থক্য ছিল না। মনে করা হত, আকাশের সূর্য, চাঁদ, গ্রহ, নক্ষত্রের বিশেষ বিশেষ অবস্থান আমাদের জীবনে নানারকম প্রভাব ফেলে। পুরোনো সময়ের পাশ্চাত্যের লোকেরা আকাশকে কল্পনা করত একটি বিশাল গোলকের মতো। তারা মনে করত এই নভোগোলকের তলের ওপর সম্পূর্ণ বেড় দিয়ে আছে একটি কাল্পনিক বৃত্তাঞ্চল, যা ১২-টি অংশে বিভক্ত। এই ১২-টি অংশে ছিল ১২-টি পৃথক পৃথক তারামণ্ডলী, যা বেশ কিছু তারার সমষ্টি। এই তারাগুলিকে যোগ করে তারা বিভিন্ন বস্তু, প্রাণীর অবয়ব কল্পনা করত। এগুলিকে বলা হত রাশি। এরকম ১২-টি পৃথক তারামণ্ডলীকে একত্রে বলা হত জোডিয়াক। এই জোডিয়াকের ওপর ভিত্তি করেই পাশ্চাত্যে হয় মানুষের ভবিষ্যৎগণনা, জ্যোতিষচর্চা। এই ১২-টি তারামণ্ডলীর অন্যতম হল সিংহ তারামণ্ডলী বা সিংহ রাশি। এই তারামণ্ডলীর তারাগুলো জুড়ে জুড়ে একটি সিংহের অবয়ব পাওয়া যায়। সিংহ রাশিকে পাশ্চাত্যে বলা হয় লিও। প্রাচীন গ্রিকরা মনে করত নিমিয়ার ওই মৃত সিংহটিকে দেবতারা আকাশে সিংহ রাশি হিসেবে স্থান দিয়েছেন। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে রাতের আকাশে দেখা যায় এই লিও বা সিংহ তারামণ্ডলীটিকে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের পয়েন্টার বা সূচক তারাগুলিকে দক্ষিণ

দিকে বাড়িয়ে দিলে সিংহ তারামণ্ডলী পাওয়া যাবে। সিংহ তারামণ্ডলীটিকে সহজেই চিনে নেওয়া যায় এটির কয়েকটি মূল তারা নিয়ে গঠিত স্পষ্ট আকারের একটা কাস্তে থেকে। আমরা যদি দক্ষিণ দিকে মুখ করে আকাশের সর্বোচ্চ সীমায় থাকা তারামণ্ডলীটিকে দেখি, তাহলে মনে হবে স্পষ্ট একটি সিংহের আকৃতি। যার মাথা হল ওই কাস্তেটা। এই তারামণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটি হল আলফা লিওনিস বা মঘা। দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম তারাটি হল বিটা লিওনিস বা ডেনেবোলা। ভারতে ডেনেবোলা উত্তরফাল্গুনী নামে পরিচিত। উত্তরফাল্গুনী তারাটি এই সিংহটির লেজকে নির্দেশ করে।

ডেনেবোলা বা বিটা লিওনিস হল একটি নবীন নক্ষত্র। ৪০০ মিলিয়ন বছর আগে এর উৎপত্তি। প্রকৃতির দিক দিয়ে এটি একটি A type, যেন সিকোয়েন্স তারা। মেন্স সিকোয়েন্স তারারা তাদের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেনকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে এবং চারটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস নিউক্লিও সংযোজন প্রক্রিয়ায় একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে একটি হিলিয়াম পরমাণু ও প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে, যা নক্ষত্রের তাপ ও আলো সৃষ্টির উৎস। ডেনেবোলার ব্যাসার্ধ সূর্যের প্রায় ১.৭৩ গুণ এবং উজ্জ্বলতা সূর্যের প্রায় ১৫ গুণ। তারাটি সূর্য থেকে ৩৬ আলোকবর্ষ দূরে আছে। বর্ণালি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এটি A3 Va প্রকৃতির। ডেনেবোলার বাইরের তলের তাপমাত্রা প্রায় ৮৫০০ কেলভিন। পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহগুলোর মতো তারারাও নিজেদের অক্ষের চারিদিকে পাক খায়। ডেনেবোলার এই ঘূর্ণন-বেগ ১২৮ কিলোমিটার প্রতিসেকেন্ড। যা সূর্যের বিষুবীয় অঞ্চলের ঘূর্ণন-বেগ ২ কিলোমিটার প্রতিসেকেন্ডের থেকে অনেক বেশি। ডেনেবোলার আপাত প্রভাব ১.৬, কিন্তু এর ঔজ্জ্বল্য রাতের আকাশে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমে-বাড়ে। উত্তরফাল্গুনীকে Delta Scuti Variable গোত্রের তারাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গোত্রের তারাগুলির উজ্জ্বলতা দিনে প্রায় দশ বার কমে বাড়ে।

নবীন তারাদের ঘিরে এক ধরনের ধূলিকণা ও বরফের বলয় দেখতে পাওয়া যায়। একে Debris Disk বলে। এই ধূলিকণা ও বরফের বলয়টি সাধারণত তারাটির বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যেতে থাকে। কারণ এই Debris Disk-এর মধ্যে থাকা ধুলো ও বরফকণা নক্ষত্রের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে পরস্পরের মধ্যে ধাক্কা খেতে খেতে ক্রমশ জমাট বেঁধে গ্রহ বা উপগ্রহ তৈরি করে।

ডেনেবোলাকে ঘিরে থাকা এই Debris Disk-টির ব্যাসার্ধ তারাটি থেকে ৩৯ অ্যাস্ট্রোনমিকাল ইউনিট দূরত্বে বা সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের ৩৯ গুণ। এবং এই বলয়টির তাপমাত্রা ($-153^{\circ}C$) বা 120K। Debris Disk থাকার জন্য মনে করা হয় ডেনেবোলারও নিজস্ব গ্রহমণ্ডল আছে। আমাদের পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগুলিকে মনে করা হয় সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান এরকমই একটি Debris Disk থেকে তৈরি হয়েছে। ডেনেবোলা নক্ষত্রের নামটি দেনেব আলাসেদ নামের সংক্ষিপ্তকরণ। সিংহ তারামণ্ডলীতে তারাগুলিকে একসঙ্গে জুড়ে যে-সিংহটিকে কল্পনা করা হয়েছে, তার লেজের অংশে যে-তারা রয়েছে, সেটাই ডেনেবোলা বা উত্তরফাল্গুনী। তাই আরবিতে ডেনেবোলাকে বলে দানাব-অল-আসাদ বা সিংহের লেজ। পঞ্চদশ শতাব্দীর জ্যোতির্বিদ উলুগ বেগ তারাটির নাম দেন আল-শারফাহ্। যার অর্থ পরিবর্তনকারী। কারণ, মনে করা হত, এই তারার জন্য আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়। একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ অলবিরুনি ডেনেবোলা সম্পর্কে লেখেন: যখন এই নক্ষত্রটির উদয় হয় তখন গরম কমে যায়, আবহাওয়া শীতল হয় এবং এর অস্ত যাওয়ার সঙ্গে আবহাওয়া গরম হয়। প্রাচীন চীনের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশের পাঁচটি তারাকে পাঁচ জন সম্রাটের সিংহাসন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ডেনেবোলা তাদের মধ্যে একজন। প্রাচীন চীনে একে বলা হত ইউদিডুয়ো-ই।

অতনুমিথুন মণ্ডল

বইভব

বিশ্বপরিচয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। আশি টাকা।

বাংলাভাষায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিজ্ঞানসম্মত পরিচয়

ছাত্রজীবনের ভালো লাগা বইটি লেখার প্রয়োজনে এখন আবার পড়তে গিয়ে নতুন করে মুগ্ধ হয়েছি। মুগ্ধতা শুধু রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে নয়। বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা বলেও মুগ্ধ হয়েছি, তাও নয়। একজন মস্ত বড়ো কবি সাহিত্যের ভেতর দিয়ে বিজ্ঞানের সত্য প্রকাশের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। 'বিশ্বপরিচয়' পড়তে গিয়ে এই বিষয়টি বেশ গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। শুধু নাড়া দিয়েছে বললে সবটা ঠিক বোঝানো যাবে না। নাতিদীর্ঘ এই বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থটি ছাত্র-ছাত্রী তো বটেই, সকলেরই পড়া উচিত। বইটির বিষয়ে আলোচনা করার সময় এর বিষয়বস্তু অথবা উপজীব্য কী, আর তা নিশ্চয়ই উল্লেখ করা প্রয়োজন, তবে গ্রন্থটির সারসংক্ষেপ এই আলোচনায় ইচ্ছে করেই অনুপস্থিত রাখছি। পাঠকদের বইটির বিষয়ে উৎসাহী হওয়া কেন প্রয়োজন, সেই বিষয়ে দু-একটি কথা জানাতে চাই।

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উদ্দেশে লেখা একটি চিঠি রয়েছে একেবারে শুরুতে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখাটিকে গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে দেখা যেতে পারে। এখানে রবীন্দ্রনাথ অনেক দরকারি কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। বিশ্ববিশ্রুত কবি বিজ্ঞানের বিষয়ে লেখার সময়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, এটি অনধিকার প্রবেশ হল না তো? তিনি বেশ দীর্ঘ কৈফিয়ত পেশ করেছেন এখানে। বিজ্ঞানের আঙিনায় নতুন শিক্ষার্থীকে প্রবেশ করিয়ে প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজটি করতে চেয়েছেন তিনি। সাহিত্যের সহায়তায় এই কঠিন কাজটি করেছেন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বিজ্ঞানের যথার্থতা যেন বিঘ্নিত না হয়, এ-বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ সতর্কতা।

বইটি পড়তে গিয়ে এর স্বাদু গদ্য আকর্ষণ করে। সাহিত্যের ডানায় ভর দিয়ে এগোয় বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়ের আলোচনা। সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়গুলির ব্যাখ্যা ও আলোচনা পাঠকের অনুরাগ তৈরি করে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বিজ্ঞানী বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী। বিজ্ঞান তাঁদের সহজ বিচরণ ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী নন। তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থটি পাঠকের প্রশংসা অর্জন করবে। পরিভাষার ব্যবহার

বিজ্ঞান বিষয়ক যেকোনো রচনার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করে। রবীন্দ্রনাথ বর্তমান গ্রন্থে একেবারেই পরিভাষার ব্যবহার করেননি, বিজ্ঞানের জটিল আলোচনা সহজ সাহিত্যের ভাষায় অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে করেছেন। কিন্তু সাহিত্যের ভাবাবেগ বিজ্ঞানের যথার্থতার ওপর ছাপ ফেলে তাকে বিকৃত করে তোলেনি। এখানেই সব থেকে বড়ো জিত এই রচনার।

উপসংহার বাদ দিয়ে পাঁচটি বিভাগে বিন্যস্ত হয়েছে বইটি। পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক এবং ভূলোক— এই পাঁচটি অধ্যায়। পরমাণুর ভেতরের গঠন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। দূরত্ব তাপমাত্রা বর্ণ ইত্যাদি বিষয়ে এত সুন্দরভাবে ধারণা তৈরি করা হয়েছে, নিতান্ত অনভিজ্ঞ মানুষও বিজ্ঞানের কথা বুঝতে পারবেন। পরমাণুর গঠন থেকে শুরু করে রঞ্জনরশ্মি, এমনকী কসমিকরশ্মি অবধি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভালোভাবে বুঝতে গেলে অণুবীক্ষণ ও দূরবিন দুইয়েরই প্রয়োজন। খুব ছোটো জিনিসের ভেতর দেখতে অণুবীক্ষণ লাগে। আবার মহাকাশ, গ্রহনক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জ পর্যবেক্ষণ করতে দূরবিনের প্রয়োজন। প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বাইরে অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে মানুষের জানা ও বোঝার যে-আকাঙ্ক্ষা, তা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে সৌরজগৎ ও গ্রহলোক নিয়ে আলোচনা রয়েছে। কীভাবে বিভিন্ন গ্রহের উৎপত্তি এবং তাদের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক কীরকম, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সূর্যের সমস্তটাই গ্যাস। পৃথিবীর সব উপাদান যে সূর্যের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড উত্তাপে গ্যাসীয় অবস্থায় রয়েছে, বর্ণলিপিযন্ত্রের রেখাপাত থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সৌরজগতে গ্রহগুলির অবস্থান, তাদের পারস্পরিক দূরত্ব, তাদের উপাদান এইসব বিবরণ পড়তে পড়তে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে অবাক বিস্ময় জন্মায়। নক্ষত্রদের প্রথম আরম্ভ যেমন নীহারিকায়, তেমনি পৃথিবীতে জীবলোকে যা প্রকাশ পেল, তাকে বলা যেতে পারে প্রাণের নীহারিকা। ঘন লালার মতো অপরিস্ফুট ছড়িয়ে পড়া প্রাণপদার্থ তখনকার ঈষৎ গরম সমুদ্রজলে ভেসে বেড়াত। তার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটোপ্লাজম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই জীবন-ধারণযোগ্য চৈতন্যপ্রকাশক অবস্থা একমাত্র এই পৃথিবীতেই রয়েছে।

বালককাল থেকেই বিজ্ঞানের রস-আস্বাদনের প্রতি আগ্রহ ছিল রবীন্দ্রনাথের। বাবার সঙ্গে ডালহৌসি বেড়াতে গিয়ে আকাশের নক্ষত্র দেখার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন কবি। বড়ো সুন্দর লিখেছেন, "দেখতে দেখতে গিরিশৃঙ্গের বেড়া-দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত।" জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞান, এই দুটি বিষয়ে তাঁর অনুরাগের কথা জানা যায়। ক্রমাগত পড়তে পড়তে তাঁর মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। এর ফলে অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে কবিকে রক্ষা করেছে। অথচ তাঁর কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ লোকসান ঘটেনি।

আজ থেকে আশি বছর আগে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। আজকের দিনে এর প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চয়ই বিচার করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানকে শুধু পাণ্ডিত্যের বিষয় হিসেবে দেখলে চলবে না। বিজ্ঞানের আলোয় দৃষ্টির স্বচ্ছতা আনতে হবে। বিজ্ঞানের আঙিনায় নতুন শিক্ষার্থীকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে পরিশ্রমসাধ্য রচনাটির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থটি আগ্রহ নিয়ে পড়বে এই আশা করছি। এমনই ভাষার জাদু যে, তরতরিয়ে পড়ে ফেলা যায়। অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর মনে হবে, কঠিন বিষয় এমন সহজ করে বুঝে গেলাম! 'বিশ্বপরিচয়' আমাদের চারপাশের হাজারটা দরজা খুলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিক শুধু এই কামনা দিয়ে আলোচনা শেষ করছি।

প্রদীপ সামন্ত

সবজান্তা

অক্টোবর কথা

১২ অক্টোবর, ১৪৯২ সাল। এই দিনটিতে ক্রিস্টোফাস কলম্বাস (নামটির ইংরেজীকরণ হয়েছে। আসলে তাঁর পিতৃদত্ত ইতালীয় নাম ক্রিস্তোফোরো কলম্বো। স্প্যানিশে ক্রিস্টোবাল কলোন।) নামে এক বেপরোয়া ইতালীয় নাবিক আমেরিকার মাটিতে পা রেখেছিলেন। তাঁকে আমেরিকার আবিষ্কারক বলা হয়। যদিও হাজার হাজার বছর আগে থেকেই লক্ষ লক্ষ মানুষের আবাসভূমি ছিল আমেরিকা। রাতারাতি তারা হয়ে যায় নেটিভ আমেরিকান। কিন্তু তিনিই আমেরিকায় পদার্পণকারী প্রথম ইয়োরোপীয় নন। লিফ এরিকশন [Leif Erikson, সেইসঙ্গে Ericsson, Ericson বানানদুটোও প্রচলিত (জন্ম ৯৭০, মৃত্যু ১০২০)] নামে নরওয়ের এক দুর্ধর্ষ নাবিক কলম্বাসের বহু আগেই উত্তর আমেরিকায় পৌঁছে যান। ফেরার পথে আইসল্যান্ডে গড়ে তোলেন উপনিবেশ। কিন্তু কলম্বাস ফিরে আসার পর আমেরিকা সম্বন্ধে রোমহর্ষক সব গল্প ছড়িয়ে পড়ে। লোভী ইউরোপীয় অভিযাত্রীরা দলে দলে চেষ্টা করে সে-দেশে পৌঁছোনোর। ক্রমে স্পেন, পোর্তুগাল, ইংল্যান্ড সেখানে উপনিবেশ গড়ে তোলে। দিনটি কলম্বাস ডে নামে পালিত হয় দুই আমেরিকায়। ১৯৭১ সাল থেকে ১২ তারিখের বদলে উদ্‌যাপিত হচ্ছে অক্টোবরের দ্বিতীয় সোমবার।

নভেম্বর কথা

১১ নভেম্বর ১৯১৮। এই দিনে শেষ হয় ভয়ংকর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। শুরু হয়েছিল ১৯১৪ সালের ২৮ জুন বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্চডিউক ফ্রানৎস ফার্দিনান্দ এক সার্বিয়াবাসীর গুলিতে নিহত হওয়ায়। অস্ট্রিয়া এই হত্যাকণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করে এবং সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে দু-দেশের বন্ধুরাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে। তবে যুবরাজের হত্যাকাণ্ডই যুদ্ধের একমাত্র কারণ ছিল না। উনিশ শতকে শিল্পবিপ্লবের কারণে সহজে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং তৈরি পণ্য বিক্রির জন্য উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতা এবং আগের দ্বন্দ্ব-সংঘাতই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ। যুদ্ধে একপক্ষে ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্য, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, জার্মান ও বুলগেরিয়া— যাদের বলা হত কেন্দ্রীয় শক্তি। অপরপক্ষে সার্বিয়া, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি, রুমানিয়া ও আমেরিকা। এদের বলা হত মিত্রশক্তি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ৯০ লক্ষ যোদ্ধা ও ৫০ লক্ষ নিরীহ মানুষ নিহত হয়। খরচ হয় প্রায় ১৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রত্যক্ষ ও ১৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরোক্ষ, যা ইতোপূর্বে ঘটিত যেকোনো যুদ্ধব্যয়ের চেয়ে অনেক বেশি।

ডি সে ম্ব র ক থা

১৭৯১ সালের ৫ ডিসেম্বর প্রয়াত হন অমর সুরস্রষ্টা উলফগাং আমাদিউস মোৎসার্ট। জন্মেছিলেন ১৭৫৬-র ২৭ জানুয়ারি, অস্ট্রিয়ার সালজবার্গ শহরে। ইংরেজিতে যাদের চাইল্ড প্রদিজি বলা হয়, মোৎসার্ট ছিলেন তেমনই শিশুপ্রতিভা। সংগীতানুরাগীদের জন্য রেখে যান ছ-শো অপেরা, নাতিদীর্ঘ অপেরা, পিয়ানো ও স্ট্রিং কোয়ার্টেটের অর্কেস্ট্রা, বেহালার সোনাটা, সেরিনেইডস, মোটেটস, মাসেস-সহ অনেক ধরনের সংগীত। বেঁচেছিলেন মাত্র ৩৫ বছর। তাঁর সিম্ফনিগুলো আজও কনসার্টে, অর্কেস্ট্রায় সমান জনপ্রিয় হয়ে আছে। সুরস্রষ্টা মোৎসার্টের নিজের হাতে লেখা একটি মিউজিক স্কোর সম্প্রতি উদ্ধার হয়েছে পশ্চিম ফ্রান্সের নাতেঁস পাঠাগার থেকে। সুরটি ১৭৮৭ সালের পরে কোনো এক সময়ে করা।

জা নু য়া রি ক থা

১ জানুয়ারি— ১৯৯৯ সালের এই দিনটি বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের একটি স্মরণীয় দিন হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা পেয়েছে। এই দিন জন্ম নেয় এক নতুন মুদ্রা— ইউরো। অতীতে ইউরোপের যেসব দেশ নানা সময়ে যুযুধান ছিল, সেরকম এগারোটি দেশ একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেয়, আজ থেকে তারা নিজেদের মধ্যে ইলেকট্রনিক আর্থিক ও ব্যাবসায়িক লেনদেনের জন্যে নতুন মুদ্রাটি ব্যবহার করবে। এটিই হবে ইউরোপের একক মুদ্রা। এর ফলে ইউরোপের বিশাল অংশ এক মুক্ত বাজারে পরিণত হয়, এককথায় যাকে বলা যায় কমন মার্কেট। সেদিনের অংশগ্রহণকারী দেশগুলি হল— অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লাক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল এবং স্পেন। পরে এই ইউরোর অধীনে আসে ইউরোপের আরও দেশ। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নে রয়েছে ২৮-টি দেশ। তার মধ্যে ১৮-টি দেশে চলে ইউরো। এই দেশগুলোকে বলে ইউরোজোন। এখন বিশ্ববাজারে ইউরো বেশ শক্তিশালী মুদ্রা, যার দাম ডলারের থেকেও বেশি। ১ ইউরো সমান মোটামুটি ১.১৭ ডলার।

ফে ব্রু য়া রি ক থা

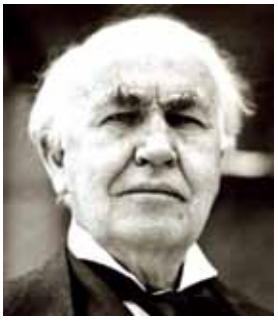

১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি ওহিয়োর মিলানে বিখ্যাত মার্কিন আবিষ্কারক টমাস আলভা এডিসনের জন্ম। তাঁকে আমেরিকার সেরা উদ্ভাবক বলা হয়। বৈদ্যুতিক বাল্ব, ফোনোগ্রাম, মুভি ক্যামেরা-সহ মোট বারোশোটি নতুন উদ্ভাবনের পেটেন্ট তাঁর নামে। ভয়ংকর উত্থান-পতনের জীবন। কিন্তু একদিনের জন্যেও হতাশ হননি। অক্লান্ত পরিশ্রমী এই মানুষটি মৃত্যুকালে (১৯৩১, ১৮ অক্টোবর) রেখে যান ১৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাঁর বিখ্যাত একটি উক্তি এরকম: 'Genius is one percent inspiration and ninetynine percent perspiration', যার বাংলা দাঁড়ায়— প্রতিভা বিকশিত হতে দরকার মাত্র এক শতাংশ প্রেরণা আর বাকি নিরানব্বই শতাংশই ঘাম, অর্থাৎ পরিশ্রম।

মা র্চ ক থা

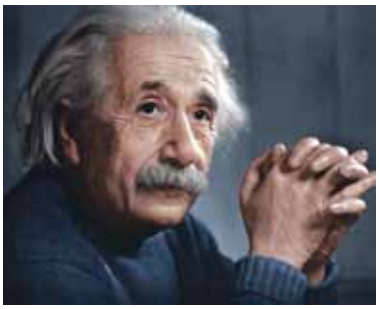

১৪ মার্চ ১৮৭৯ সাল। এই দিনে জার্মানির ঐতিহ্যবাহী উল্ম শহরে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম। বাবা হেরমান আইনস্টাইন, মায়ের নাম পাওলিনা কখ। আধুনিক বিজ্ঞানের দুটি স্তম্ভের একটি, আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব, তাঁরই আবিষ্কার। অন্যটি কোয়ান্টাম মেকানিকস। আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্ব সময়, স্থান, বিষয় এবং শক্তি সম্পর্কে চিন্তা করার নতুন উপায় নিয়ে এসেছিল। যুগান্তকারী এই আবিষ্কারের জন্যে ১৯২১ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। গবেষণাগার বলতে তাঁর ছিল একটি ছোট্ট লেখার টেবিল-চেয়ার, কলম আর দরকারমতো সাদা কাগজ। ১৯৩৩-এ নাৎসি একনায়ক হিটলার জার্মানির শাসনক্ষমতা দখল করলে আইনস্টাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং আর জার্মানিতে ফিরে আসেননি। বরাবর তিনি নাৎসি জার্মানির স্পষ্টভাষী সমালোচক ছিলেন। তাঁর শক্তি-সংক্রান্ত বিখ্যাত সমীকরণ $E=MC_2$। মৃত্যু ১৯৫৫ সালে।

এ প্রি ল ক থা

১৬ এপ্রিল ১৮৮২ সালে দুনিয়া কাঁপানো চলচ্চিত্রকার এবং অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিনের জন্ম লন্ডনে। পিতৃদত্ত নাম চার্লস স্পেন্সর চ্যাপলিন। বাবা যদিও ছিলেন গায়ক-অভিনেতা, মা লিলি হার্লি অভিনেত্রী এবং গায়িকা— তাঁদের ছিল ভয়ংকর গরিবের সংসার। ফলে চ্যাপলিনের শৈশব আর বাল্যকাল কেটেছে অপরিসীম দারিদ্র্যে। পথনাটকে তাঁর অভিনয় দেখে মার্কিন চলচ্চিত্র-প্রযোজক মার্ক সেনেট তাঁকে আবিষ্কার করেন। সেই শুরু তাঁর হলিউডের জীবন। পরবর্তীকালে যে-ফিল্মগুলো চ্যাপলিনের ক্লাসিকস হিসেবে গণ্য হয়েছে, সেগুলো— 'দ্য কিড', 'দ্য গোল্ড রাশ', 'সিটি লাইটস' এবং 'মডার্ন টাইমস'। ১৯৪০-এ তিনি তৈরি করেন 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর' নামে ফিল্মটি, যাতে অ্যাডল্ফ হিটলারের চরিত্রে নিজেই অসাধারণ অভিনয় করেছেন। ১৯৭৫-এ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৭৭ সালে ৮৮ বছর বয়সে সুইৎজারল্যান্ডে চার্লি চ্যাপলিনের মৃত্যু। ■

সব পরিবারেরই কিছু বলবার কথা থাকে, যে-কথা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। আল-আমীন পরিবারেরও আছে তেমন কিছু কথা, কিছু খবর। এই বিভাগে সেইসব সমাচার।

আল-আমীন উৎসব ২০১৮

ভিশন ৩০-এ এক লক্ষ সদস্যের পরিবার হবে আল-আমীন মিশন। সেই সময়ের মধ্যেই ৫০ বিঘা জায়গার ওপর আধুনিক মানের একটি গার্লস ক্যাম্পাস তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের নাম করা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। মিশনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেবার সময় এই পরিকল্পনার কথা জানান মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম।

আল-আমীন উৎসব ২০১৮ অনুষ্ঠিত হল মিশনের মূল ক্যাম্পাস হাওড়ার খলতপুরে। শনিবার মিশনের পতাকা উত্তোলনের পর দুই ছাত্রের কোরআন তেলাওয়াত ও তার অনুবাদপাঠের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। স্বাগত-বক্তব্যে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম স্মরণ করেন ৪০ বছর আগে এই মিশনের ভাবনার শরিকদের। কৃতজ্ঞতা জানান খলতপুর গ্রামের মা-বোনেদের, যাঁদের মুষ্টির চাল মিশনকে প্রাণ দিয়েছিল। জেলা থেকে রাজ্যের মানুষ, বিশেষ করে পতাকা-গোষ্ঠীর কর্ণধার শিল্পপতি মোস্তাক হোসেনের বদান্যতায় মিশন দ্রুত এই জায়গায় আসতে পেরেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। পাশাপাশি, তাঁর চিন্তা-চেতনাকে পুষ্ট করতে এবং মানুষের জন্য ভাবতে শেখানোর জন্য তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন তাঁর আব্বা মহম্মদ ওমর আলি মিদ্যা, শিক্ষক আবুল কাশেম সিদ্দিকী ও অধ্যাপক অরূপ ভট্টাচার্য প্রমুখের।

তিনি আরও বলেন, রামকৃষ্ণ মিশন দেখে আমরা প্রথম অনুপ্রাণিত হই এবং নানা ঐতিহাসিক কারণে পশ্চাৎপদ শ্রেণির জন্য এক নীড় গড়তে চেয়েছিলাম। যারা সমাজে গুরুত্বহীন, তারাও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, যদি তাদের শিক্ষা, অর্থ, পরিবেশের অভাব দূর করে স্বপ্ন দেখানো যায়। সেই স্বপ্ন বড়ো হতে হতে আজ ৬৮-টি শাখায় ১৮ হাজার প্রাক্তনী, ১৪ হাজার বর্তমান পড়ুয়া, ২ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিলে ৪০ হাজারের এক বৃহৎ আল-আমীন পরিবার। মিশনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম বলেন, কোন মানুষের কোন কথা আমাদের জীবনের গতিপথই পরিবর্তন করে দিতে পারে, তা আমরা কেউই জানি না। মিশনের সুপারিনটেনডেন্ট আবদুল হাসেম মল্লিক বলেন, আল-আমীন মিশন আগে ছিল স্বপ্ন, এখন সেটি বাস্তব এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবক ও রাজ্যবাসীর বিশ্বাসও।

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহ. শহিদুল ইসলাম কোরআনের আয়াত উল্লেখ করে বলেন, এই মহাগ্রন্থ মানবতাবাদের জয়গান করে। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত পর্যবেক্ষণ 'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক' এবং 'ইসলামীয় দেহ' উল্লেখ করে দেশের জন্য এই দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের ওপর জোর দেন। উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে আগত স্বামী উত্তমানন্দ বলেন, যাদের ভিশন থাকে সেটাই মিশন এবং মানুষের কল্যাণের অনুপ্রেরণা এখান থেকেই আসে।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংসদ ইদ্রিস আলি ও সাংসদ আহমদ হাসান ইমরান, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের কমিশনার জি এইচ ওবাইদুর রহমান, ডাইরেক্টরেট অফ মাদ্রাসা এডুকেশনের ডিরেক্টর আবিদ হোসেন, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সচিব রেজানুল করিম তরফদার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটির সচিব রাকিবুর রহমান, ডব্লিউবিএমডিএফসি-র জেনারেল ম্যানেজার মহ. সামসুর রহমান, উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি প্রমুখ। মিশনের প্রাক্তনী বিশিষ্ট উদ্যোগপতি মোরশেদ আলি মোল্লা প্রতিবছর একটি করে অ্যাম্বুলেন্স মিশনকে উপহার দিয়ে থাকেন। এ-বছর তিনি দুটি গাড়ি দিয়েছেন। একটি অ্যাম্বুলেন্স এবং আরেকটি শিশুদের নিয়ে যাওয়ার স্কুলগাড়ি। অনুষ্ঠানে মিশনের মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, নার্সিং প্রভৃতিতে কৃতীদের পুরস্কৃত করা হয়। সন্ধ্যায় মিশনের পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলের নজর কাড়ে। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের সচিব ডা. পি বি সেলিম, আই.এ.এস.। তিনি বক্তব্যে বলেন, আমরা নিজেদের ইতিহাস সঠিকভাবে জানি না। সেই কারণে নিজেদের মূল্যায়নও করতে সক্ষম হই না। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার অর্ধশতক পরেও আমরা এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শিখিনি। এটা আমাদেরই ব্যর্থতা। এখনও পর্যন্ত মুসলমান ছেলে-মেয়েরা উচ্চশিক্ষা, বিশেষ করে আই.এ.এস. বা আই.পি.এস. হবার দৌড়ে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। এর জন্য সেল্ফ কনফিডেন্ট হবার পরামর্শ দেন তিনি। আল-আমীন উৎসবের শেষ দিনের অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ও নিবন্ধক ড. নূরসাদ আলি, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম সচিব শাকিল আহমেদ, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. সেখ আবু তাহের কামরুদ্দিন, প্রবাসী প্রকৌশলী ও উদ্যোগপতি সেখ আরিফ হোসেন, বিধায়ক আবু তাহের খান।

সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বলেন, আল-আমীন মিশন গড়ে উঠতে মোস্তাক হোসেন, সাহাজান বিশ্বাস, আকবর হোসেন-সহ বহু মানুষ জমি, অর্থ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। রাজ্যে এতদিন মুসলমান ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের অভাব ছিল, সে-অভাব কিছুটা পূরণ হয়েছে। এবার আমরা সিভিল সার্ভিসের ওপর জোর দিতে চাইছি। তিনি জানান, দেশ ভাগের পর মাত্র দু-জন বাঙালি আই.এ.এস. হয়েছেন। মোস্তাক মুর্শেদ ও সেখ নুরুল হক। মঞ্চে উপস্থিত পি বি সেলিমের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, সেলিম সাহেবরা দু-ভাই আই.এ.এস. হয়েছেন। গোটা ভারতে এটিই একমাত্র মুসলমান পরিবার, যেখানে দু-ভাই আই.এ.এস.। ওঁরা হতে পারলে আল-আমীনের ছেলে-মেয়েরা কেন হতে পারবে না। পি বি সেলিম পশ্চিমবঙ্গের ছেলে-মেয়েরা যে আই.এ.এস. হতে পারছে না, তার জন্য আত্মবিশ্বাসের অভাবকে চিহ্নিত করেন। জানার অভাব, পড়াশোনার অভাবেই সেটা হয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তাই এই দু-ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের জোর দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। অন্যান্য বক্তারাও উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি এ-দিন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মিশনের তরফে পুরস্কৃত করা হয়। মিশন প্রাঙ্গণে এ-দিন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৯৫ জন দাতা রক্তদান করেন। উল্লেখ্য, প্রতি বছরই আল-আমীন মিশন এ-ধরনের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। শুধু আল-আমীনের প্রাক্তনীরা নয়, সমাজসেবী শুভানুধ্যায়ীদের উজ্জ্বল উপস্থিতিও এক নতুন মাত্রার সৃষ্টি করে। ছাত্র-শিক্ষক-শুভানুধ্যায়ীদের এক মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয় এই অনুষ্ঠান।

পূর্ব মেদিনীপুরে প্রথম শাখা উদ্‌বোধন

দক্ষিণবঙ্গের আল-আমীন শাখাশূন্য জেলা পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অবশেষে প্রথম শাখার উদ্‌বোধন হল গত ১৯ জানুয়ারি। জেলাসদর তমলুক থেকে প্রায় ৩৫ কিমি দূরে তমলুক-দিঘা রেল লাইনের দেশপ্রাণ স্টেশনের কাছাকাছি ভগবানপুর ব্লকের কোটবাড় গ্রামে এই শাখার উদ্‌বোধন করেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম।

মিশনের সূচনায় খলতপুর শাখায় মাত্র ৭ জন পড়ুয়া থেকে কোটবাড় এবং আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে উদ্‌বোধন হতে চলা জলপাইগুড়ি জেলার একটি নতুন শাখা ধরে মোট ৬৮-টি শাখায় প্রায় ১৪ হাজার আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, "এই জেলায় এটি আমাদের প্রথম শাখা এবং পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির প্রায় ৫০ জন ছাত্র আজ এখানে ভর্তি হলেও ভবিষ্যতে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।" তিনি উপস্থিত অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের এই সুখবরও দেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এই শাখায় এলাকার দুঃস্থ ও গরিবদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য হেলথ কেয়ার ইউনিট গড়ে তোলা হবে। এই ইউনিটে মিশনের প্রাক্তনী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের

পরিষেবা পাওয়া যাবে। এ-প্রসঙ্গে তিনি ভগবানপুরের কৃতী সন্তান ও মিশনের প্রাক্তনী বিশিষ্ট অস্থিরোগ-বিশেষজ্ঞ ডা. হিবজুল আলি খানের নাম উল্লেখ করেন। এই শাখার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হাজি সেখ সফিরুদ্দিন এখানে বালিকা শাখার প্রতিষ্ঠা করার জন্য মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, বালক ক্যাম্পাসের মতো বালিকা ক্যাম্পাসের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুরই ব্যবস্থা করতে তিনি প্রস্তুত। এই ক্যাম্পাসে শুধুমাত্র এতিমদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এর ব্যয়ভার বহনে সবসময় আগ্রহী বলে তিনি ঘোষণা করেন। মিশনবন্ধু খায়রুদ্দিন খান এই জেলায় মিশনের প্রথম শাখা প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী ডা. আব্দুল কাদের, কারি মুফিজুল ইসলাম খান, হামিদ খান প্রমুখ।

লোহাপুর ও সুজাপুরে নতুন শাখা

১৩ জানুয়ারি বীরভূম জেলার নলহাটি ব্লকের লোহাপুর গ্রামে নতুন বালক শাখার উদ্‌বোধন করা হয়। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির প্রায় ৯০ জন ছাত্র এখানে ভর্তি হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নওদার বিধায়ক আবু তাহের খান, সমাজসেবী আব্দুর রহমান, স্থানীয় তিনটি হাই স্কুলের তিন প্রধান শিক্ষক আব্দুল হামিদ, আব্দুল কুদ্দুস, জাকির হোসেন প্রমুখ। পরের দিন অর্থাৎ ১৪ জানুয়ারি মালদার গয়েশবাড়ি থানার সুজাপুর বালক শাখাটি উদ্‌বোধন করেন এম নুরুল ইসলাম। পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির ৬৬ জন পড়ুয়া প্রথম দিন ভর্তি হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেলপুকুর ক্যাম্পাসের সুপারিনটেনডেন্ট মাইনুদ্দিন আহমেদ, সমাজসেবী হাজি আব্দুর রউফ প্রমুখ।

নয়াবাজ ক্যাম্পাসে বার্ষিক অনুষ্ঠান

আল-আমীন মিশন একাডেমি, নয়াবাজ ক্যাম্পাসে গত ২০ ও ২১ জানুয়ারি দু-দিন ধরে বার্ষিক অনুষ্ঠান ও পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হল। পড়ুয়াদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভরপুর ছিল এ-আয়োজন। ২১ জানুয়ারি সান্ধ্যকালীন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে গতবছরের মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও উচ্চ-মাধ্যমিকে কৃতীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম ছাড়াও বহু বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন। সম্মাননীয় অতিথিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম। তিনি তাঁর দীর্ঘ ভাষণে নিজের জীবনের লড়াই ও বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থার বাস্তবচিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দুনিয়ায় আজ ভালোবাসার এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণের খুবই অভাব। আমরা কথা বলাতে চ্যাম্পিয়ন কিন্তু প্রয়োগে একেবারে শেষের সারিতে। ফলে আমাদের সমাজের সমস্যার জন্য মুখ্যত আমরাই দায়ী। পড়ুয়াদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "কেবল ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিঙে নিজেদের ভিশনকে কেন্দ্রীভূত করলে হবে না, বিজ্ঞানের নানা বিভাগেও ছড়িয়ে পড়তে হবে। কেবল পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত নয় তোমাদের ভিশন হওয়া উচিত গোটা বিশ্ব।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, কেবলমাত্র ইহকালের সাফল্যই আমাদের জন্য শেষ কথা নয়, পরকালের বিষয়টিকেও খুবই গুরুত্ব দিতে হবে। একটা ভারসাম্য মধ্যপন্থার অনুশীলন করতে হবে আমাদের, যেটি ইসলাম ও মহানবি (সা.)-র মূল কথা।" অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এম নুরুল ইসলাম বলেন, "নদিয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে নিজের অধ্যবসায় ও কঠোর লড়াইয়ের মাধ্যমে তিনি আজ বিশ্বের অন্যতম সেরা এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এরচেয়েও বড়ো কথা তিনি সংখ্যালঘু সমাজে মেধা বিকাশের অক্লান্ত যোদ্ধা। তিনি আমাদের আল-আমীন পরিবারেরই একজন হয়ে উঠেছেন, এটা আমাদের এক পরম প্রাপ্তি।" তিনি পড়ুয়াদের উদ্দেশে বলেন, "তোমাদের অবশ্যই ২২ জন খেলোয়াড়ের মধ্যেই থাকতে হবে, মাঠের বা টিভির দর্শক হলে চলবে না।" তিনি সমাজে শিল্পপতি ও বড়ো ব্যবসায়ীর গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করেন। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ক্যাবিনেট, কিচেন ক্যাবিনেট, আইনসভা, প্রশাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ নিয়ে তাঁর একেবারে অন্য ধরনের আলোচনায় পড়ুয়া-সহ উপস্থিত সকলেই খুবই সমৃদ্ধ হন। আল-আমীন মিশন স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেন শিক্ষার্থীদের পদার্থবিদ্যা ও গণিতের প্রতি আরও বেশি অভ্যাসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, আকারে ছোটো হলেও নয়াবাজ ক্যাম্পাস পড়ুয়াদের রেজাল্টে অবশ্যই বিশাল। তাঁর মতে, আল-আমীন মিশন সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চায়, কারণ, আল-আমীন মিশন এক শিক্ষা-আন্দোলনের নাম, এক ভাবনার নাম। বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ও মিশনের প্রাক্তনী মোরশেদ আলি মোল্লা বলেন, "আমি মিশনের তৃতীয় ব্যাচ ও ৭৪ নম্বর পড়ুয়া। মিশনের ছাত্র হতে পেরে গর্ব অনুভব করি।" ছাত্রদের প্রতি তাঁর উপদেশ, "তোমারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যাই হও-না-কেন, অবশ্যই ভালো মানুষ হও।" মিশনের কলকাতা অফিসের অন্যতম আধিকারিক মহম্মদ মহসীন আলি একজন জাপানি গবেষকের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, মানুষকে ভালোবাসার মতো যেকোনো ইতিবাচক কাজই আমাদের সাফল্য প্রদান করতে পারে। ধারাবাহিকভাবে ভালোবাসা ও ধনাত্মক চিন্তাভাবনার অনুশীলন খুবই জরুরি।

রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার' কবিতার নাট্যরূপ সন্ধ্যা ৮ টায় অভিনীত হয়। শিক্ষক মহ. সরফরাজ মোল্লার পরিচালনায় পড়ুয়াদের অভিনীত এই নাটকটি উপস্থিত সবারই মন ভরিয়ে দেয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিশনের অন্যতম সদস্য মহম্মদ

আলমগীর বিশ্বাস, নয়াবাজ শাখার ইনচার্জ খন্দকার মহিউল হক ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক রবিউল হোসেন খান, আইনজীবী কাজি সাজ্জাদ আলম, সমাজসেবী হাজি গিয়াসুদ্দিন মল্লিক ও সফিউদ্দিন মল্লিক, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা জারিনা খান, শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী, প্রাক্তনী ও বর্তমান পড়ুয়াবৃন্দ।

সূর্যপুর শাখায় বার্ষিক অনুষ্ঠান

আল-আমীন মিশন একাডেমি, সূর্যপুর ক্যাম্পাসে গত ২২ ও ২৩ জানুয়ারি দু-দিন ধরে কৃতী-সংবর্ধনা, বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল। এই অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম। তিনি মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির প্রখ্যাত অধ্যাপক। তাঁর অনুকরণীয় জীবনসংগ্রাম ও অনুপ্রেরণাদায়ী আলোচনায় সবাই মুগ্ধ হন। তিনি আমাদের সমাজের নানা অসংগতি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এ-সমস্যা থেকে উত্তরণের পথের দিশাও দেন। তাঁর আলোচনায় তিনি বার বার আত্মসমালোচনায় মগ্ন হওয়ার পরামর্শ দেন। কারণ, মানুষ বেঁচে থাকে তাঁর নিজ কর্মের মাধ্যমে। অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে পেয়ে মিশন পরিবার ধন্য বলে মন্তব্য করেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, জ্ঞানচর্চা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অধ্যাপক ইসলামের মধ্যে। তিনি তাঁর নিজ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি প্রতিবেশী সমাজের সঙ্গে আমাদের নিরন্তর আদান-প্রদানের কথা উল্লেখ করেন। সংখ্যালঘু সমাজে শিক্ষা প্রসারের কাজ করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ

প্রমুখের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার কথাও তিনি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন। তাঁর হাত দিয়েই সূর্যপুর শাখার দেয়াল পত্রিকা 'কারুবাকী' প্রকাশিত হয়। সন্ধ্যায় পড়ুয়াদের দ্বারা 'নরক গুলজার' নাটক অভিনীত হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, দুই কর্মাধ্যক্ষ ইউনুস সরদার ও অজয় মাইতি, সমাজসেবী হাজি মহিউদ্দিন সরকার, হাজি নাসিরুদ্দিন মণ্ডল, মিশন পরিবারের সদস্য দিলদার হোসেন, মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস, মহম্মদ আশরাফুল হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের আয়োজন ও সঞ্চালনায় ছিলেন সূর্যপুর শাখার ইনচার্জ রাজিব হাসান, শিক্ষকমণ্ডলী ও সহযোগীবৃন্দ।

বারুইপুরে নতুন শাখা

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অলোক কবিতা লেনে আল-আমীনের বালিকা শাখার উদ্‌বোধন করেন মিশনের

সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। তিনি উদ্‌বোধনী বক্তব্যে বলেন, মিশন প্রথম থেকেই সমাজের পিছিয়ে পড়া সমাজকে যুগোপযোগী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে সচেষ্ট ছিল। তিন দশকের ক্রমাগত প্রচেষ্টায় মিশনে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য অভিভাবকদের আগ্রহ দেখে ভালো লাগলেও, আমরা মনে করি এখনও বহু পথ যেতে বাকি। আমাদের ইচ্ছা অনেক বড়ো হলেও সাধ্য খুবই সীমিত। তারই মাঝে রাজ্যের বহু সহৃদয় ও শিক্ষাপ্রেমী মানুষদের পাশে নিয়ে আমরা নতুন নতুন আবাসিক শিক্ষালয় বাড়াচ্ছি। আজকের এই বালিকা শাখা সেই প্রচেষ্টারই অংশ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিশন পরিবারের সদস্য মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস, মহম্মদ আশরাফুল হোসেন, শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী আব্দুল হান্নান সর্দার, আঞ্জানা বেগম, সমাজসেবী ডা. জাহাঙ্গির, জুলফিকার গাজী প্রমুখ।

মিলনমোড় ক্যাম্পাসে নতুন হস্টেল

১১ ফেব্রুয়ারি মিশনের ইংরেজি মাধ্যম শাখা মিলনমোড়ে একটি নতুন হস্টেল ভবনের উদ্‌বোধন করেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। এই শুভক্ষণে তিনি স্মরণ করেন মরহুম মোল্লা আজিজুল হককে, যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন পিছিয়ে পড়া সমাজের পড়ুয়ারা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতার পাঠও গ্রহণ করবে। তাঁর সেই স্বপ্ন এখন সফল হচ্ছে। তিন তলা এই হস্টেলটি সম্পূর্ণ হলে প্রায় ২০০ জন পড়ুয়ার আবাসস্থল হয়ে উঠবে এটি। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বিধায়ক রফিকুর ইসলাম মণ্ডল বলেন, সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রে জাগরণ এনেছে আল-আমীন। আমাদের পরিষেবার ক্ষেত্র আলাদা ও সীমাবদ্ধ হলেও মিশন রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার মাধ্যমে উৎকর্ষ অর্জন করিয়ে জীবিকায় তাদের প্রতিষ্ঠিতও করছে। উল্লেখ্য, বিধায়কের পুত্র মিলনমোড় শাখার ছাত্র। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিশনের প্রাক্তনী ও এডিএসআর রমজান আলি, এডিএসআর জীবনকৃষ্ণ দাস, এই শাখার প্রিন্সিপাল মেহেবুবা আলি প্রমুখ।

আল-আমীনে প্রজাতন্ত্র দিবস

রাজ্যের প্রায় সব জেলা ও প্রতিবেশী অসম, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, বিহারে বিস্তৃত মিশনের ৬৮-টি আবাসিক ও ২৬-টি অনাবাসিক ক্যাম্পাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৬৯-তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হয়। মুখ্য অনুষ্ঠান মূল শাখা হাওড়ার খলতপুরে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে জাতীয় পতাকা

উত্তোলন করেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন মিশনের সুপারিনটেনডেন্ট এম আব্দুল হাসেম মল্লিক ও অন্যান্যরা।

জলপাইগুড়িতে নতুন শাখা

১১ ফেব্রুয়ারি অপর এক অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের কাছে আল-আমীনের একটি নতুন বালক শাখার উদ্‌বোধন করেন এম নুরুল ইসলাম। উপস্থিত অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ও গ্রামবাসীদের উদ্দেশে তিনি জানান, সাড়ে সাত বিঘে জমির উপর এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। বর্তমানে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্ররা এখানে পড়ার সুযোগ পেলেও ভবিষ্যতে এখানে ছাত্র-ছাত্রী মিলিয়ে প্রায় ৩৫০ জন পড়ার সুযোগ পাবে। তিনি আরও বলেন, দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে মিশনের আবাসিক শিক্ষালয় কম থাকায় উত্তরবঙ্গেও পর্যায়ক্রমে মিশনের বিস্তার ঘটবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিশনের বেলপুকুর শাখার সুপারিনটেনডেন্ট মাইনুদ্দিন আহমেদ, সমাজসেবী সেখ সাজাহান, আনোয়ার হোসেন, আনিসুদ্দিন মিয়াঁ প্রমুখ।

বাবনান শাখায় বার্ষিক অনুষ্ঠান

হুগলির পোলবা থানার বাবনান গ্রাম চিকন হস্তশিল্পের জন্য বিখ্যাত। দুর্গাপুর হাইওয়ে ২ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে গ্রামটির দিকে তাকালে দূর থেকেই পরিষ্কার দেখা যায় দাঁড়িয়ে থাকা এক উঁচু ইমারত। এটিই আল-আমীন একাডেমির বাবনান শাখা, যা গ্রামটির পরিচয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। গত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি আল-আমীনের এই ক্যাম্পাসের বালক ও বালিকা শাখায় আলাদা দুটি অনুষ্ঠানে কৃতী-সংবর্ধনা ও বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। প্রথম দিন বালক বিভাগের জমজমাট অনুষ্ঠানের পরের দিন বালিকা বিভাগের অনুষ্ঠানটিও উপভোগ্য হয়।

এক ছাত্রীর কোরআন পাঠ দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। পরে অনুষ্ঠানের সভাপতি মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম তাঁর স্বভাবসুলভ মিতস্বরে মিশনের আগামী পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বাবনান শাখার প্রতিষ্ঠায় এই এলাকার শিক্ষাপ্রেমী জীবিত ও প্রয়াত সহযোগীগণকে স্মরণ করে তিনি বলেন, এই শাখা ধীরে ধীরে মিনি খলতপুর ক্যাম্পাস হয়ে উঠছে। কারণ, প্রাকৃতিক মনোরম নিঝুম পরিবেশ ও বহু মেধাবী পড়ুয়ার মিলনস্থল এটি। তিনি বলেন, জীবজগতের অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হল, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও চিন্তাশক্তি। এর সহায়তায় আমরা হতে পারি ফেরেশতা অথবা শয়তান, যদিও উভয়েরই অবয়ব কিন্তু মানুষের। স্বাধীনতা-উত্তর এ-বাংলার সংখ্যালঘু সমাজের অধিকাংশ অগ্রণী মানুষ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাড়ি জমান। এখানকার সমাজ হয়ে ওঠে অভিভাবক থেকেও কিছুটা অভিভাবকহীনের মতো। তাঁর ভাবনায়, "আল্লাহ্‌পাকের সেরা উপহার আমাদের সন্তান। প্রতিটি শিশুই অসাধারণ। কিন্তু এদের আমরা অনেকেই সঠিক অভিভাবকত্ব দিতে পারিনি, তাদের মেধাবিকাশের পরিপূর্ণ লালনপালনে খামতি ছিল আমাদের। সে থেকেই আল-আমীনের প্রাথমিক ভাবনা ছিল যথোপযুক্ত অভিভাবকত্ব (Guardianship) প্রদানের। এর ফলে কী ঘটল, তার অনেকটাই আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে অবগত। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডব্লিউবিসিএস অফিসার, প্রফেসর প্রমুখ ছাড়াও দেশ ও দুনিয়ার বিভিন্ন গবেষণাগারে আল-আমীনের প্রাক্তনীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তিন দশকের এই সাফল্যের পর আমরা আবার নতুন করে ভাবছি। সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিতদের (Under-privileged) জন্যই বিশেষ করে ভাবতে হচ্ছে। পুয়োরেস্ট অফ দ্য পুয়োর অর্থাৎ দরিদ্রতমদের প্রতি দায়বদ্ধতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটাতে বদ্ধপরিকর আমরা। আর্থিক দিক বাদ দিলেও এ-বছর আমাদের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসা প্রায় ৪০০ জন এতিমের মধ্যে মাত্র ১০০ জনই মিশনে ভর্তি হয়। কিন্তু তাদের না নেওয়ার বেদনা আমরা অনুভব করি। খলতপুরে শুরু হওয়া হেলথ কেয়ার ইউনিটের শাখা বাবনান-সহ প্রত্যেক ক্যাম্পাসে খোলা হবে বলেও তিনি জানান। তুষার-গলা নদীর পানির সাগরে মিলিত হওয়ার সঙ্গে মস্তিষ্কের মেধার বরফকে গলিয়ে জ্ঞানসাগরে মিলিত হওয়ার তুলনা করেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক সুভাষ ঘড়া। শিক্ষকদের জ্ঞানবৃক্ষের ছায়ায় সার্বিক শিক্ষা নিয়ে পড়ুয়াদের বনস্পতি হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

দু-দিন ধরেই উৎসবমুখর বাবনান ক্যাম্পাস। সকাল থেকেই ছাত্রীদের নানারকম সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপে খুশির রং লেগে যায়। কী ছিল না এই অনুষ্ঠানে, বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় হামদ ও নাত-এ-রাসুল, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, কুইজ, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিতর্ক, গল্পপাঠ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, হাস্যকৌতুক, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, নবীনদের বরণ, কৃতীদের সংবর্ধনা ও প্রথমবার এই শাখার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ইত্যাদি। বালক ও বালিকা উভয় ক্যাম্পাসে আলাদা আলাদা দেয়াল পত্রিকা 'সংকল্পে'-র লেখা ও চিত্রায়ণে মন ভরে যায়। একজন ছাত্রীর গাওয়া সংগীতের তালে তালে ব্ল্যাকবোর্ডে অন্য এক পড়ুয়ার চিত্রায়ণ দেখে উপস্থিত সবাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীদের চোখ আবছা হয়ে ওঠে যখন নবম শ্রেণির ছাত্রী শিরিন মোল্লা আবৃত্তিকার শুভ দাশগুপ্তের খুবই জনপ্রিয় 'জন্মদিন' কবিতাটি আবৃত্তি করে। সন্ধ্যার পর বিভিন্ন শ্রেণির

ছাত্রীরা অনেকগুলি নাটক মঞ্চস্থ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প 'ছুটি' ও জসিমউদ্দিনের কবিতা 'কবরে'-র নাট্যরূপে ছাত্রীদের অভিনয় ও সংলাপ দেখে অবাকই হতে হয়। খুবই উপভোগ্য সুস্থ সংস্কৃতির উপস্থাপনায় বাবনান শাখার পড়ুয়াদের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক দক্ষতা অবশ্যই প্রশংশনীয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেতা বি.এড. কলেজের ইনচার্জ অভিষেক ভট্টাচার্য, সমাজসেবী মালতী হাঁসদা, প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় কমিটির সদস্য আলহাজ মীর আফজল, আনোয়ার হোসেন মণ্ডল, সৈয়দ গোলাম মওলা, নাসিরুল হক, মিশন পরিবারের সদস্য আলমগীর বিশ্বাস প্রমুখ। এই শাখার গণিত ও ভূগোলের দুই শিক্ষিকা মনিরা খাতুন ও সেরিনা খাতুনের সঞ্চালনায় ছিল অনন্য ভাবনা, যা আয়োজনটিকে সব সময় আকর্ষণীয় ও শ্রুতিমধুর রাখে। বাবনান শাখার ইনচার্জ বাসিরুদ্দিন খান ও শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলীর অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে আধুনিকতা ও সমাজভাবনার ছাপ ছিল স্পষ্ট।

জিপমার এন্ট্রান্সে অষ্টাদশ

ভারতের খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জওহরলাল ইনসটিটিউট অফ পোস্ট-গ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (জিপমার)-এর ভর্তির পরীক্ষার মেধাতালিকায় দেশের মধ্যে আঠারোতম স্থান অধিকার করেছেন বছর চব্বিশের সেখ আজহারউদ্দিন। এম.বি.বি.এস. পাস করেছেন চলতি বছরের মার্চ মাসে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হতে দেশের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠ নিতে এবার পাড়ুই থেকে পুদুচেরি পাড়ি জমাতে চলেছেন।

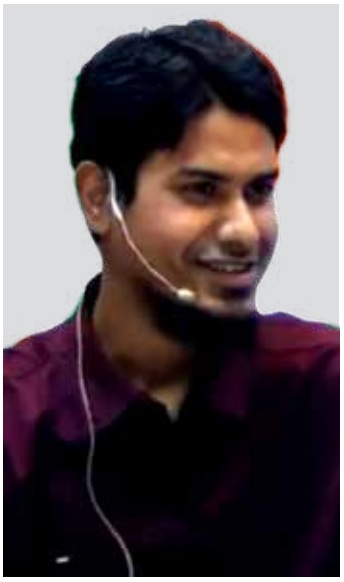

উৎকর্ষের নিরিখে চিকিৎসাশাস্ত্রে দেশের সেরা প্রথম চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হল দিল্লিস্থিত এইমস, পিজিআই চণ্ডীগড়, নিমহান্স বেঙ্গালুরু ও জিপমার পুদুচেরি। এই চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিজস্ব ভর্তির পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নেয়। দেশের বাকি সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি নেওয়া হয় সর্বভারতীয় পৃথক একটি সাধারণ ভর্তিপরীক্ষার মাধ্যমে। দেশের সেরা মেধাবী ছেলে-মেয়েরাই ওই চারটি প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পান। আজাহার সেই মেধাবীদের মধ্যে নিজের নাম নথিভুক্ত করে বাংলার নাম উজ্জ্বল করেছেন। জিপমার-এ ভর্তির পরীক্ষার সদ্য প্রকাশিত মেধাতালিকায় প্রায় আঠারো হাজার চিকিৎসক-পড়ুয়ার নাম আছে। আজহারকে নিয়ে প্রথম কুড়ির তালিকায় জনা চারেক আছেন পশ্চিমবঙ্গের। দেশের মধ্যে একমাত্র মুসলমান নাম তাঁর। আজহারের বাবা সেখ সোরমান আলি, মা সাহানা বিবি দু-জনেরই পড়াশোনা মাধ্যমিক পর্যন্ত। বছর পঞ্চাশের সোরামান সাহেব আগে ব্যাবসা করতেন, এখন কিছু করেন না। মা গৃহবধূ। উচ্চ-মাধ্যমিক পাস আজহারের দাদা ঠিকাদারের অধীনে দেখাশোনার কাজ করেন। এক বোন, বিবাহিতা। এমন পরিবারে যে আজহারের সাফল্য খুশির জোয়ার আনবে, তা আর না বললেও চলে। আল-আমীন মিশনে পড়েছেন একাদশ শ্রেণি থেকে। তার আগে তিনি পড়েছেন দুবরাজপুর রামকৃষ্ণ মিশনে। মাধ্যমিকে ৮৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করার পর আল-আমীন মিশনে ভর্তি হন। ২০১১ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৩.৬ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাস করার সঙ্গেই ওই বছরই জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে র‍্যাঙ্ক করেছিলেন ৬০৪। ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল থেকে এম.বি.বি.এস. সম্পূর্ণ করার অল্প দিনের মধ্যেই আবার স্নাতকোত্তর পড়ার সুযোগ পেলেন, তাও জিপমার-এর মতো প্রতিষ্ঠানে। এই সাফল্য পাওয়ার পিছনে মূল কারণ কী জিজ্ঞাসা করায় আজহার জানালেন, "আল-আমীন মিশন থেকে আমি আর্থিক ছাড় পেয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু তারচেয়েও বড়ো যেটা পেয়েছিলাম, সেটা হল সময়নিষ্ঠা আর সংযত জীবনযাপনের পাঠ। পড়াশোনার উচ্চস্তরে সাফল্যের ক্ষেত্রেও এটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।" ধর্মপ্রিয় আজহার আপাতত জিপমার থেকে সার্জারিতে স্নাতকোত্তর করতে চাইছেন। পড়াশোনার পাঠ শেষে নিজের রাজ্যে ফিরে এসে বৃহত্তর স্বাস্থ্য উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী তিনি।

নিমহান্স এন্ট্রান্সে ভারত-সেরা

দেশের অন্যতম আর এক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান বেঙ্গালুরুস্থিত ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরোসায়েন্স (নিমহান্স)-এর এ-বছরের পোস্ট-ডক্টরাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় শীর্ষস্থান দখল করলেন আল-আমীনের প্রাক্তনী ডা. আলতাফ হোসেন। প্রায় ১১০ জন এম.ডি./ডি.এন.বি. ডিগ্রিধারী ভারতীয় চিকিৎসক পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপ ইন চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট সাইকিয়াট্রি কোর্সের একমাত্র আসনের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেন। অসংরক্ষিত একমাত্র আসনে সফল হয়ে শেষতক বাজিমাত করলেন হাওড়া জেলার ডিহিভূরসুটের বাঙালি সন্তান ডা. আলতাফ। মেধাবী আলতাফ আসণ্ডা আদর্শ শিক্ষা সদন থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। পরে একাদশ শ্রেণিতে বাড়ির কাছাকাছি আল-আমীনের খলতপুর ক্যাম্পাসে তিনি ভর্তি হন। এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর সাফল্যের সূচনা। প্রথমে উচ্চ-মাধ্যমিকে সাফল্য এবং পরে মিশনে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কোচিং নিয়ে ২০০৩ সালে মেডিকেলে র‍্যাঙ্ক করেন ৫৭০। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ থেকে ২০০৮ সালে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। ২০১৩ সালে কলকাতার পিজি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ থেকে সাইকোলজিক্যাল মেডিসিনে ডিপ্লোমা (DPM) এবং সাইকিয়াট্রি বিষয়ে নিমহান্স থেকেই ২০১৫ সালে এম.ডি. (MD) পাস করেন। আমরা কথায় কথায় রাঁচির পাগলাগারদে পাঠাবার যে-কথা বলি, সেই সেন্ট্রাল

ইনসটিটিউট অফ সাইকিয়াট্রিতে বর্তমানে তিনি সিনিয়র রেসিডেন্ট। নিমহান্স-এর সদ্য ঘোষিত ফলে আলতাফের সাফল্য সমগ্র বাঙালি সমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছে। পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং আল-আমীন পরিবারে তাই খুশির হাওয়া।

মধ্যবিত্ত পরিবারের আলতাফের আব্বা একজন গ্রামীণ চিকিৎসক। তাঁদের একটি ওষুধের দোকানও আছে। আলতাফের মা একজন গৃহবধূ, স্ত্রী ডা. নিলোফার ইসলাম এবং বোন ডা. ফেরদৌসি খাতুন উভয়েই চিকিৎসক। ডা. ফেরদৌসিও মিশন থেকেই উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জয়েন্টের কোচিং নিয়ে ডাক্তারি পাস করেছেন। কথা প্রসঙ্গে আলতাফ তাঁর এই সাফল্যের জন্য আব্বা-মা ছাড়া আল-আমীন মিশনের প্রভূত অবদানের কথাও বললেন। সেক্রেটারি স্যার, শিক্ষকগণ এবং সর্বোপরি মিশনের আবাসিক পরিবেশই তাঁর ভিত গড়ে দিয়েছিল বলে তিনি জানান। মিশনের দক্ষ ও উৎসর্গীকৃত শিক্ষকদের নিরলস প্রচেস্টার মাধ্যমে গুণ ও মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ রাজ্যজুড়ে মিশনের বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে পড়ায় বিশেষত সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হচ্ছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এ ছাড়া ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশাদারি কেরিয়ারের জন্য কোচিং ও উৎসাহে বহু ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হচ্ছেন। তিনি বলেন, একমাত্র শিক্ষাই যেকোনো সম্প্রদায় বা সমাজকে উন্নত করতে পারে, যে-কাজটা আল-আমীন খুবই সুচারুরূপে করছে। তাঁর মতে, সরকারের তরফে আধুনিক শিক্ষায় আরও বেশি অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। পরিবর্তনশীল সময়ে কার্যকর নীতি ও কর্মপন্থাও গ্রহণ করতে হবে। নারীদের আরও বেশি সংখ্যায় মিশনের শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। রাজ্যের ছাত্র ও তরুণদের উদ্দেশে তিনি বলেন, প্রত্যেককে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে পরিশ্রম ও চেষ্টায় নিয়োজিত থাকতে হবে, কারণ, সাফল্যের জন্য বয়সের কোনো সীমা নেই। তাঁর জীবনের লক্ষ্য কী জিজ্ঞাসার উত্তরে সংগীতের প্রতি অনুরক্ত আলতাফ জানান, একজন সংবেদনশীল ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট হওয়া এবং একটি অর্থপূর্ণ, সামাজিক জীবনযাপন করা।

নিমহান্স প্রবেশিকায় প্রথম

মাদ্রাসা থেকেই প্রাথমিকের পাঠ শুরু। মাদ্রাসার শিক্ষা ও আদর্শকে অবলম্বন করেই একের পর এক ধাপ এগিয়ে সেরা চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরোসায়েন্স (নিমহান্স)-এর সর্বভারতীয় ডিএম কোর্সের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন মিশনের প্রাক্তনী মুহাম্মদ শামিম মণ্ডল। এশিয়া তথা ভারতের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান নিমহান্স। এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় দেশের ৫০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করেন। মোট আসন মাত্র ৪-টি। তার মধ্যে প্রথমেই নাম রয়েছে এ-রাজ্যের শামিম মণ্ডলের। ডক্টরেট অফ মেডিসিন (ডি.এম.) কোর্সের জন্য প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তিনি। এমসিএইচ-এ তাঁর র‍্যাঙ্ক ৮। সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে তিনি এখন বেঙ্গালুরুর নিমহান্স-এ ২ জুলাই থেকে ডি.এম. কোর্সে যুক্ত হচ্ছেন।

বাড়ি হাওড়া জেলার ধুলাগড়ে। তাঁর আব্বা হাবিবুর রহমান মণ্ডল জরির কাজ করেন। মা রেহেনা বেগম বাড়িতেই থাকেন। চার ভাই। শামিমকে পড়ানোর জন্য বড়োভাই পড়াশোনা ছেড়ে কাজে যোগ দেন। এলাকার কোলোরা হাই স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা। সেখান থেকে মাধ্যমিকে ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে উচ্চ-মাধ্যমিকের জন্য আল-আমীনের খলতপুর শাখায় ভর্তি হন। উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৯.৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হন। ২০১১ সালে রাজ্য মেডিকেলের এন্ট্রান্সে ৭০১ র‍্যাঙ্ক করেন। ২০১৬ সালের এম.বি.বি.এস.-এর চূড়ান্ত বর্ষে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের মধ্যে

সর্বোচ্চ নম্বর অধিকার করেন তিনি। সেই জন্য তাঁকে দেওয়া হয় সাম্মানিক মেডেল। এর পর ওই হাসপাতালেই ইন্টার্নশিপ। পেডিয়াট্রিক্স বিভাগের সর্বোচ্চ নম্বরের জন্যও ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে সম্মাননা দেন। তিনি মনে করেন, সাফল্য নিয়মিত পড়াশোনার মাধ্যমেই আসে। পাশাপাশি ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এইমস-এর জাতীয় স্তরের এন্ট্রান্সে ১৮৯ র‍্যাঙ্ক করেন। একই সময়ে পিজিআই চণ্ডীগড়ের প্রবেশিকায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হন। এ দিকে ২০১৮ সালের নিট (পিজি) প্রবেশিকায় তাঁর র‍্যাঙ্ক হয় ৭৬১। এই পরীক্ষায় রাজ্যস্তরে র‍্যাঙ্ক হয় ৩২। আগামী দিনের ইচ্ছা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ডাক্তারির পাশাপাশি চিকিৎসকদের শিক্ষক হতে চান। পশ্চিমবঙ্গে স্নায়ু চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশেষ পরিষেবা দেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। পাশাপাশি বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে চান তিনি। এ-রাজ্যের বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরুতে যান। একই চিকিৎসা পরিষেবা পশ্চিমবঙ্গে অল্প খরচে করাতে চান তিনি। তিনি মনে করেন, কোনো পড়াশোনায় ভালো সাফল্য না এলেও লেগে থাকলে পরবর্তী সময়ে সফল হওয়া যায়। সেটাই তিনি জীবনে দেখেছেন। শামিম বলেন, "পড়াশোনা করতে গিয়ে বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আল্লাহ্‌ই সমস্যা কাটিয়েছেন। আল্লাহ্‌র সহযোগিতায় এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। শুধু পড়াশোনায় নয়, নৈতিকতার বিশ্বাসকে পাশে রাখতেই হবে।" নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, "আমি যখনই পড়তে বসেছি, সেই সময় 'রাব্বি রহলি সাদরি ... ' এই দোয়া পড়ে পড়তে বসেছি। তার সঙ্গে নামাজ তো রয়েছেই। পড়ার জন্য মনোযোগকে ঠিক রাখতে এগুলি খুবই জরুরি।" তিনি বলেন, অধ্যবসায় ও তপস্যার মতো করে নিতে হবে পড়াশোনাকে। তিনি বলেন, "নিঃশব্দে লড়ে যাও, সাফল্য তোমার বাজনা বাজাবে।"

ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের সেরা

হুগলির জাঙ্গিপাড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম অযোধ্যা। গ্রামের সিংহভাগ মানুষের জীবিকা চাষ আবাদ। সেই গ্রাম থেকেই এম.বি.বি.এস.-এর ফাইনাল পরীক্ষায় কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন মিশনের প্রাক্তনী আলমিনা খাতুন। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে নজরকাড়া ফল করে রাজ্য মেডিকেলের প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হন আলমিনা। এরপর ২০১২ সালে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের এম.বি.বি.এস. কোর্সে ভর্তি হন। মেডিকেল কোর্সের প্রতিটি পরীক্ষায় ভালো ফলের সঙ্গে ফাইনালেও প্রথম হন আলমিনা। এই কৃতিত্বের জন্য ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ৬৭-তম পুনর্মিলন উৎসবে তাঁর হাতে সম্মান তুলে দেওয়া হয়। আগামীতে পেডিয়াট্রিক্স বিষয়ে এমডি বা স্নাতকোত্তর করার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর।

আলমিনার আব্বার ইচ্ছা ছিল মেয়েকে বড়ো করে ডাক্তার বানাবেন। উপরওয়ালার দোয়ায় সেই ইচ্ছা পূরণ হলেও, তা দেখতে পেলেন না আলমিনার আব্বা। হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন তাঁর আব্বা। সমস্ত বাধা পেরিয়েও ডাক্তারি পড়াশোনায় সফল হন তিনি। এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে আলমিনার বক্তব্য, "আমাকে চিকিৎসক তৈরির স্বপ্ন ছিল আব্বার। সেই স্বপ্ন পূরণের দৌড়ে এগিয়ে সফল হয়েছি, এত ভালো লাগছে। তবে মনে খুব কষ্ট হয়, যাঁর জন্য আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, তিনিই দেখে যেতে পারলেন না।" তবে তাঁর আব্বার ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করতে অদম্য পরিশ্রমে কার্পণ্য করেননি আলমিনা। প্রাথমিকে গ্রামের পাঠ চুকিয়ে মাধ্যমিকে ৮৮ শতাংশ, উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হন। তাঁর এই সাফল্যের পিছনে যেমন আব্বা, মা ও বড়োভাইয়ের ভূমিকা রয়েছে, তেমনি আল-আমীন মিশনের পক্ষ থেকেও সবরকম সহযোগিতা করা হয়েছে। মিশনের সহায়তার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আলমিনা। ডাক্তারি পড়াশোনার শেষে গ্রামবাংলার রোগীদের চিকিৎসা করাই

একমাত্র ইচ্ছা তাঁর। তিনি জানান, চিকিৎসা পরিষেবার মাধ্যমে মানুষের পাশে থেকে সমাজসেবায় জীবনকে অতিবাহিত করার ইচ্ছা রয়েছে।

ডাক্তারি পড়তে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে আলমিনার পরামর্শ, "কারো যদি ইচ্ছা থাকে ডাক্তার হব, সেই ইচ্ছাশক্তিকে ধরে রাখতে হবে পড়ুয়াদের। তাহলেই সাফল্য আসতে বাধ্য। পাশাপাশি নিজের কাজকে এগিয়ে দিলে, আল্লাহ্‌র রহমতে সাহায্যও আপনা-আপনি চলে আসে। তা আমি দেখেছি।"

মুসলমান ছাত্রীদের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, ছাত্রীদের এগিয়ে যাওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে। মুসলমান ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও যদি শিক্ষায় এগিয়ে আসে, তাহলে সমগ্র সমাজের উন্নয়ন সম্ভব। তাঁর বক্তব্য, পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মানুবর্তিতাও প্রয়োজন। বড়োদের সম্মান ও ছোটোদের স্নেহ করলে সম্মিলিত দোয়া এগিয়ে যাওয়ার সহায়ক হয়। পড়াশোনা-ধর্ম-কর্ম সবকিছুকে আঁকড়ে ধরেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে আলমিনা জানান।

মিলন উৎসবে কেরিয়ার কাউন্সেলিং

পার্কসার্কাস ময়দানে মিলন উৎসব ২০১৮-এর উদ্‌বোধন হয় গত ১০ ফেব্রুয়ারি। এটি ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। প্রতিদিন দুপুর ১২ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত এই মেলায় মিশনের একটি স্টল সবারই নজর কাড়ে। কেরিয়ার কাউন্সেলিং ব্লকে আল-আমীন মিশনেরও একটি স্টল ছিল। মিশন পরিবারের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই সদস্য মহম্মদ মহসীন আলি ও জাহির আব্বাস এই স্টলে প্রতিদিন উপস্থিত থাকতেন। স্টলে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের কেরিয়ার নিয়ে নানা জিজ্ঞাসার জবাব, পরামর্শ ও পরিকল্পনা জানান তাঁরা। মহম্মদ মহসীন আলি জানান, "আমরা যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এই স্টল দিয়েছিলাম, তাতে প্রত্যাশার থেকে বেশি সাড়া

মিলেছে। আল-আমীন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া ছাড়াও, তাদের অভিভাবকরাও উপস্থিত হয়ে নানা বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন।" তিনি আরও জানান, পড়ুয়াদের উৎসাহ দেখে মনে হচ্ছে, এই ধরনের উদ্যোগ আরও আগে নিলে ভালো হত। এই কয়েক দিনে বেশ কয়েকশো তরুণ-তরুণী আমাদের স্টলে এসেছিলেন বলে তিনি জানান। জাহির আব্বাস বলেন, সরকারি বৃত্তি ছাড়াও আরও বহু বেসরকারি সংস্থার স্কলারশিপের খবরাখবর, জয়েন্ট এন্ট্রান্স, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডব্লিউ.বি.সি.এস.-সহ উচ্চ-মাধ্যমিকের পর উচ্চশিক্ষা ও কেরিয়ার নিয়ে পরামর্শ নেন ছাত্র-ছাত্রীরা। মিশন প্রকাশিত এ পি জে আব্দুল কালাম নিয়ে এক প্রবন্ধ সংকলন 'পৃথ্বীপুরুষ' ও 'আল-আমীন বার্তা'র বিভিন্ন সংখ্যা নিয়েও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব ডা. পি বি সেলিম ছাড়াও বহু বিশিষ্টজন মিশনের এই উদ্যোগে খুবই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

মিশনের প্রাক্তনী আজ জয়েন্ট বিডিও

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেলেগাছি নামক এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে এসে জয়েন্ট বিডিওর খাতায় নিজের নাম পাকা করলেন আইসক্রিম বিক্রেতা লতিফ লস্করের ছেলে হাবিবুল্লাহ লস্কর। তাঁর আব্বা খুব কষ্ট করেই চার ভাই ও তিন বোনের পড়াশোনার খরচ বহন করে গেছেন নীরবে। বাবার বয়স হয়েছে। এখন আর মাথায় করে আইসক্রিমের বাক্স বইতে পারেন না। ধর্মপ্রাণ অতি সাধারণ এই মানুষটি তাই বেছে নিলেন গ্রামের মসজিদের ইমামতির কাজ। দীর্ঘ কয়েক বছর ধর্মভীরু মুসুল্লিদের নেতৃত্বও দিলেন। কিন্তু শরীরের অপারগতা তো আর কারো কথা শুনবে না। সে তার নিজস্ব গতিতে প্রবহমাণ। সংসারের হাল ধরলেন বড়োভাই আবদুল রাজ্জাক লস্কর। শিক্ষিত এক বেকার যুবক। আরবি থিয়োলজি নিয়ে পড়াশোনা। কিন্তু চাকরিটা তখনও জোটেনি। নিতান্তই বেছে নিতে হল দিনমজুরের কাজ। ছোটোছেলে হাবিবুল্লাহ লস্কর ওরফে হাবিব। ছোটোবেলা থেকেই এলাকার মেধাবী ছাত্র হিসেবে সুনাম কুড়িয়েছেন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ঘোলা উচ্চ-বিদ্যালয়ে পড়াশোনা। বরাবরই ক্লাসে প্রথম হয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মন জয় করেছেন। এক শিক্ষকের সহযোগিতায় আল-আমীন মিশনে ভর্তির পরীক্ষায় বসেন হাবিব। সেখানেও সফল উত্তরণ তাঁর। সাল ২০০৪, হাবিব আল-আমীন মিশন দক্ষিণ দিনাজপুরের বেলপুকুর শাখায় নবম শ্রেণিতে ভর্তি হলেন। ২০০৬ সালে ওখান থেকেই মাধ্যমিক। প্রাপ্ত নম্বর ৭০৭।

তারপর একাদশ শ্রেণিতে আল-আমীন মিশনের হাওড়ার খলতপুরে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ২০০৮ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক। প্রাপ্ত নম্বর ৩৯৪। সে-বছরেই হাবিব জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ১৬৭৫ র‍্যাঙ্ক করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিন্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ পান। ২০১২ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে কলেজ ক্যাম্পাসিঙের মাধ্যমে 'হিন্দুস্থান টাইমস' ও এসডি অ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড নামের দুটি সংস্থায় চাকরি পান। তবে দ্বিতীয় চাকরিটিই বেছে নেন হাবিব।

কিন্তু পিছিয়ে পড়া সমাজের জন্য কিছু করা দরকার, এই ভাবনা থেকেই ২ বছর ৮ মাস চাকরি করে এসডি অ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড থেকে ইস্তফা দেন। প্রশাসনিক পদে রাজ্যের পিছিয়ে থাকা সমাজের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি একেবারেই কম। তাই সেই শূন্যতা পূরণের ভাবনা থেকেই ইঞ্জিনিয়ারিঙের চাকরি ছেড়ে হাবিব শুরু করেন তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লড়াই।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডব্লিউ.বি.সি.এস.-এর প্রস্তুতি শুরু করেন হাবিব। ২০১৬ সালের ২৮ জানুয়ারি প্রিলি পরীক্ষায় বসেন। প্রিলিতে সফলতার পর ২০১৬-র জুলাই মাসে মেইনস পরীক্ষাতেও সফল হন। তারপর ২০১৭ এপ্রিল মাস নাগাদ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের 'এ'-গ্রুপের ইন্টারভিউর জন্য ডাক পান। সেখানেও বাজিমাত করেন। গত ১৫ মার্চে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চূড়ান্ত মেধাতালিকায় জয়েন্ট বিডিও হিসেবে নিজের নাম পাকা করেছেন। হাবিবের এই সাফল্যে এখন খুশির জোয়ার বইছে আল-আমীন মিশন-সহ গোটা পিছিয়ে পড়া সমাজে। ফোনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম-সহ একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা।

পিছিয়ে পড়া সমাজের তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে হাবিবের বক্তব্য, "আমেরিকার কালো মানুষগুলোকে যেভাবে নিজেদের মেধাসত্তার প্রমাণ দিতে হয়, তেমনি এ-দেশে আমাদের মতো পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষদেরও প্রমাণ করতে হবে— আমরাও পারি। সুতরাং হাল না ছেড়ে লড়াই চালিয়ে যাও, এক সুন্দর সকাল তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"দারিদ্র্যই হচ্ছে পিছিয়ে পড়া সমাজের কাছে সবচেয়ে বড়ো সন্ত্রাস। তাই পিছিয়ে পড়া সমাজ থেকে দারিদ্র্য নামক সন্ত্রাসীকে দূর করতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"— অকপট স্বীকারোক্তি হাবিবের। পিছিয়ে পড়া সমাজে নারীশিক্ষা নিয়েও কাজ করতে চান হাবিব। আর এই কাজে পাশে পেয়েছেন নিজের সহধর্মিণী তথা আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনী ও কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী উম্মে হানিকে। নারীশিক্ষার প্রতি উম্মে হানির উদ্দীপনা ও হাবিবের আগ্রহ দু-জনকে কাছাকাছি নিয়ে আসে বলে জানিয়েছেন হাবিব। গত বছরে ১ নভেম্বর পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন মিশনের এই দুই প্রাক্তনী হাবিবুল্লাহ লস্কর ও উম্মে হানি।

মিশনের দুই প্রাক্তনী সাফিন বিন রহমান ও তামান্না ইয়াসমিনকে কেড়ে নিল বাস-দুর্ঘটনা

সাফিন বিন রহমান

তামান্না ইয়াসমিন

গত ২৯ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদের ভয়াবহ বাস-দুর্ঘটনায় রাজ্যবাসী ও মুর্শিদাবাদবাসীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও শোকে পাথর। আল-আমীন মিশন পরিবারের পক্ষ থেকে শোকস্তব্ধ সকল পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সাফিন বিন রহমান এক কর্মঠ তরুণ। চোখে বিশাল স্বপ্ন ও বুকে উজ্জ্বল কর্মতৎপরতা নিয়ে তিনি নিজ কাজের ক্ষেত্রে এক জনপ্রিয় অফিসার। তাঁর কর্মস্থল বীরভূমের সিউড়ির ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্প। পদ— অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যানাল অফিসার। আব্বা জিল্লার রহমানের প্রাণের টুকরা সাফিনের বাড়ি ডোমকল থানার কালীগঞ্জে। খলতপুর শাখা থেকে বিজ্ঞান বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। পরে তিনি ডব্লিউ.বি.সি.এস. পরীক্ষায় সফল হন। তিনি নিজ কর্মস্থলে যাবার জন্য দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই বাসে ছিলেন। মিশন পরিবার সাফিনের পরিবারের সঙ্গে সমব্যথী ও দুঃখী। তামান্না ইয়াসমিনও ওই দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসে ছিলেন, ছুটি কাটিয়ে বহরমপুরে ট্রেন ধরে কলকাতা আসার জন্য। তিনি কলকাতা মেট্রোপলিটন হোমিয়োপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। ২০১৪ সালে আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখা থেকে বিজ্ঞান বিভাগে সাফল্যের সঙ্গে তিনি উত্তীর্ণ হন। এক বছর জয়েন্টের কোচিং নিয়ে তিনি বি.এইচ.এম.এস.-এ ভর্তি হন। দৌলতাবাদ থানার নওদাপাড়া গ্রামের মেধাবী ডাক্তার-ছাত্রীর প্রয়াণে তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের পাশাপাশি মিশনের সমস্ত শাখায় শোকের ছায়া। মিশন পরিবার তামান্নার পরিবারের সঙ্গে সমব্যথী ও দুঃখী। মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম দুর্ঘটনার এই খবরে গভীর শোক প্রকাশ করেন। মিশনের শাখা-ইনচার্জ ও শুভাকাঙ্ক্ষী-সহ তিনি এই শোকের আবহে সমস্ত পরিবারের প্রতি সমব্যথী ও সহমর্মিতা জানান। তিনি বলেন, "এই অভাবনীয় খবরে আমরাও খুবই দুঃখিত এবং চরম ব্যথিত। আমরা আমাদের প্রতিটি শাখায় আজ সন্ধ্যায় সমস্ত প্রয়াতদের রুহের মাগফিরাত ও আত্মার শান্তি কামনার জন্য দোয়ার আয়োজন করেছি।" আল-আমীনের দুই প্রাক্তনী সাফিন বিন রহমান ও তামান্না ইয়াসমিনের চলে যাওয়া আমাদের মিশন পরিবারের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। আল্লাহ্ তাঁদের জান্নাতবাসী করুন, এ-দোওয়া ছাত্র-ছাত্রী-সহ মিশন পরিবারের সমস্ত সদস্যবৃন্দের। ■

লেখাপড়ার ফাঁকে ছোটোদের কল্পনা ডানা মেলে পাড়ি দেয় রূপ ও কথার দেশে। দিগন্তের নীল আর পরির পালক দিয়ে সেখানে তারা রচনা করে স্বপ্নের জগৎ। কাঁচা মনের সেইসব রং দিয়ে সাজানো এ-বারের পাতায় খলতপুর, মালদা এবং হাসনেচা ক্যাম্পাসের পড়ুয়াদের ছবি ও লেখা।

রিয়া পারভিন। দ্বাদশ শ্রেণি। খলতপুর ক্যাম্পাস।

পরিণতি

ইমরোজ আহমেদ
দ্বাদশ শ্রেণি, মালদা ক্যাম্পাস

অর্জুনপুর গ্রামে বাস করত একটি ছোট্ট পরিবার। তাহির ও রাজিয়া, দু-জনের সদ্য বিবাহ হয়েছে। তাহির একজন রিকশাচালক এবং রাজিয়া বাড়ির কাজ করে। কোনোভাবে সুখে-দুঃখে তাদের দিন কেটে যায়। এক বছর পরে তাদের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তারা তাদের স্নেহের সন্তানের নাম ভালোবেসে রাখে রহিম। তাহির একদিকে রিকশা চালিয়ে রোজগার করে, অন্যদিকে রহিম আস্তে আস্তে বড়ো হতে থাকে। রহিম আস্তে আস্তে বসতে শেখে, হামাগুড়ি দিতে শেখে, কথা বলতে শেখে এবং তা দেখে কষ্টের মধ্যেও তার বাবা-মা আনন্দ পায়। একবার রহিমের বড়ো অসুখ হয়, তখন তাহির ও রাজিয়া কোনো উপায় না পেয়ে তাদের যেটুকু জমি ছিল, তার কিছুটা অংশ বিক্রি করে রহিমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কিছু দিন পর রহিম সুস্থ হয়ে ওঠে।

তাহির ও রাজিয়ার বয়স বাড়তে থাকে এবং রহিমও বড়ো হয়। সামনে রহিমের মাধ্যমিক পরীক্ষা, তাই রহিম জোরতালে পড়াশোনা শুরু করে।

মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেলে, ফল প্রকাশের সময় দেখা যায়, রহিম খুব ভালো ফল করেছে। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা খুব সুনাম করে রহিমের। তার বাবা-মাও খুব আনন্দিত হয়। রহিম বিজ্ঞান নিয়ে বাইরে পড়াশোনা শুরু করে। খুব কষ্টে তার বাবা রিকশা চালিয়ে টাকা পাঠায় ছেলের কাছে। ছেলের যেন পড়াশোনায় ঘাটতি না হয়, তার জন্য তারা কতদিন অনাহারে থেকেও ছেলের জন্য টাকা জমাতে থাকে। পড়াশোনা শেষ হলে রহিম একটি ভালো চাকরি পায়, মাসের শেষে মোটা টাকার মাইনে পায়। প্রথম দিকে সে প্রত্যেক ছুটিতে শহর থেকে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার গ্রামে আসা কমে যায়, যদিও সে মাসে মাসে টাকা পাঠাত। কয়েক বছর পর দেখা যায়, রহিম আর তার বাবা-মায়ের কাছে আসে না, এমনকী টাকাও বাড়িতে পাঠায় না। এদিকে অনাহারে দিন কাটতে থাকে তাহির ও রাজিয়ার। তাহিরের এখন বয়স হয়েছে, সে সপ্তাহে দু-তিন দিন রিকশা নিয়ে বের হয়, তাতে রোজগার পর্যাপ্ত হয় না। রোজগারের অভাবে কোনোদিন একবেলা, কোনোদিন অনাহারে কাটাতে হয় তাদের।

এদিকে রহিম বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে শহরে বাস করে। সে গ্রামে আসতে চাইলেও তার স্ত্রী তাকে আসতে দেয় না। এমনকী বাড়ির সঙ্গে কোনোরূপ যোগাযোগ রাখতে দেয় না। রহিমের মা দিন-দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে, রোজগারের অভাবে তাহির স্ত্রীকে ডাক্তার দেখাতেও পারে না।

রাজিয়া ছেলের আসার অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে ও তার শরীরের অবনতি ঘটতে থাকে। এমন সময়, একদিন রাতে রিকশাস্ট্যান্ডে বুট-সুট পরা একজন বাবু এসে উঠে বসে তাহিরের রিকশাতে। তাহির আস্তে আস্তে সেই বাবুকে নিয়ে রিকশা টানতে থাকে। বাবুটি বলে, "আরে কী করছেন! তাড়াতাড়ি চলুন, এত আস্তে চললে হবে?" বাবুটি যখন রিকশাতে ওঠে তখন তাহির তাকে চিনে ফেলেছিল, কিন্তু সে নিজের পরিচয় দেয়নি।

কিছুক্ষণ পরে বাবুটি আবার বলে ওঠে, "আচ্ছা, এই বয়সে আপনি রিকশা চালাচ্ছেন কেন? আপনার কি কোনো ছেলে-মেয়ে নেই, বা তারা কি আপনাদের দেখে না?" তাহির তখন রিকশা থামিয়ে, রিকশা থেকে নেমে মুখের কাপড়টি সরিয়ে বাবুটির দিকে তাকায়। বাবুটি তখন সাপ দেখার মতো চমকে ওঠে। কারণ সে দেখে যে, রিকশাচালক লোকটি আর-কেউ না, তারই বাবা। তখন সেই বাবুটি অর্থাৎ রহিম রিকশা থেকে নেমে তার বাবার কাছে ভুল স্বীকার করে। তাহির বলে, "তোমার মা তোমার আসার অপেক্ষায় থেকে থেকে মরতে বসেছে।" রহিম তখন বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোয়। বাড়ির কাছে আসতেই দরজার বাইরে মানুষের ভিড় দেখে তাহির ও রহিম। সহসা শোনা যায় রহিমের মা মারা গেছে। এই খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাহিরও হতভম্ব হয়ে হৃদ্‌রোগের কারণে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করে। রহিম তখন কী করবে বুঝে উঠতে পারে না, তার মাথায় যেন বাজ পড়ে। সে চিন্তায়, গ্লানিতে, মানসিক চাপে পাগল হয়ে যায়।

এখন তাহির ও রাজিয়ার মমতায় গড়া ছোট্ট বাড়িটির একটি কোণে নিরাশ, অবসন্ন ও দিগ্‌বিদিকশূন্য হয়ে রহিম বসে রয়েছে নিছকই একটি পাগল।

মায়ের মতো

মহম্মদ উসমান
ষষ্ঠ শ্রেণি, হাসনেচা ক্যাম্পাস

সেইখানে সেই নীল আকাশ,
বৃষ্টি-ভেজা সুবাতাস।
সেইখানে সেই পাখির ডাক,
হাজার ফুলের মধুর চাক।
সেইখানে সেই চাঁদের আলো
গাছের পাতা লাগছে ভালো।
সেইখানে সেই গাছের সারি,
উড়ছে দেখো সবুজ পরি।
সেইখানে সেই শান্ত হাসি,
মায়ের মতো ভালোবাসি।

We Chase Quality | Success Chases Us....

Al-Ameen Mission Study Circle

A Pioneer Institute For Competitive Examinations

Crash Course & Mock Tests For
NEET(UG) & WBJEE(Engg.) 2019

8 MOCK TESTS
Starts From 3rd February 2019

132 HOURS CRASH COURSE | **Starts From 15th March 2019**

423 Within Top 50000 All India Ranks In NEET (UG) 2018

AIR-260
Md S Hammam

AIR-508
Sk Akib Uddin

AIR-975
Safiul Alam

AIR-1120
Md Sajid Sk

AIR-1314
Naim Sk

AIR-90 PH
Sahin Sultana

AIR-964 ST
Sangita Hembram

409 Rankers Within Top 15000 IN WBJEE (ENGG.) 2018

Rank 367
Sk Akib Uddin

Rank 900
Safiul Alam

Rank 966
Sk Md Rajibul

Rank 1250
Wasim Anwar

Rank 1465
Saidul Islam

Rank 1691
Asidul Rahaman

Rank 1719
Sk Riyaj

Features

We Provide

- Highly Experienced Faculty For All Subjects
- Exhaustive Study Materials With DPP & MOCK Test
- Small Batch Size
- Special Doubt Clearing Session
- Postal Programme

COURSES OFFERED

- ✓ XI-XII BOARD PREPARATION
- ✓ 2-YEAR MEDICAL & ENGG COACHING
- ✓ 1-YEAR MEDICAL & ENGG COACHING
- ✓ WBCS COACHING

Office: 8D Darga Road, Park Circus, Kolkata - 17, Ph : 033-22893769, M : 7479020079, 9434617145

সেরা মেধাবীদের সেরা প্রতিষ্ঠান ■ উচ্চতায় অদ্বিতীয় উজ্জ্বলতায় অম্লান

আল-আমীন মিশন

Al-Ameen Mission 32 years in service to the society

এক নজরে সাফল্য ২০১৮

ইমন রাজ
মাধ্যমিক ৯৫.৭%

আব্দুস সাবির মণ্ডল
উ. মা. ৯৬%

আল-তৌফিক
মাধ্যমিক ৯৫.৭%

নাদিম তৌসিফ আলি
উ. মা. ৯৫.৬%

জয়েন্ট এন্ট্রান্স

NEET-UG মেডিকেল	১০০০০-এর মধ্যে	২০০০০-এর মধ্যে	৩০০০০-এর মধ্যে	৪০০০০-এর মধ্যে	৫০০০০-এর মধ্যে
	৫৮	১৬৮	২৫৩	৩৪১	৪২৩
WBJEE ইঞ্জিনিয়ারিং	৫০০০-এর মধ্যে	৭৫০০-এর মধ্যে	১০০০০-এর মধ্যে	১২৫০০-এর মধ্যে	১৫০০০-এর মধ্যে
	৯০	২০০	২৮২	৩৪৭	৪০৯

মাইনুল হাসান
মাধ্যমিক ৯৫.৬%

মহ. জাকির হোসেন
উ. মা. ৯৫.২%

উচ্চ-মাধ্যমিক

পরীক্ষার্থী		৬০%	৭০%	৭৫%	৮০%	৮৫%	৯০%	সর্বোচ্চ
ছাত্র	১২০৭	১১৯৪	১১১৩	৯৬৩	৭০৬	৩৬২	১০৫	৯৬%
ছাত্রী	৬৫৯	৬৫৩	৫৯১	৪৬৩	২৮৭	১৩১	২২	৯৪%
সর্বমোট	১৮৬৬	১৮৪৭	১৭০৪	১৪২৬	৯৯৩	৪৯৩	১২৭	—

তানিয়া ইসলাম
মাধ্যমিক ৯৫.৩%

সরিফুল ইসলাম
উ. মা. ৯৪.৬%

মাধ্যমিক

পরীক্ষার্থী		৬০%	৭০%	৭৫%	৮০%	৮৫%	৯০%	সর্বোচ্চ
ছাত্র	৯৪১	৯২৯	৮৭৬	৮১৯	৭০৫	৫৩০	২১৮	৯৫.৭%
ছাত্রী	৪১২	৩৮৯	৩৫০	৩১০	২৬৮	১৮১	৬৩	৯৫.৩%
সর্বমোট	১৩৫৩	১৩১৮	১২২৬	১১২৯	৯৭৩	৭১১	২৮১	—

NEET AIR-260
মহ. সিনান হাম্মাম

NEET AIR-508
সেখ আকিব উদ্দিন

NEET AIR-975
সাফিউল আলম

NEET AIR-1120
মহ. সাজিদ সেখ

NEET AIR-1314
নইম সেখ

NEET AIR-1877
আরিফা খাতুন

NEET AIR-1905
শরিফ আহমেদ

NEET AIR-1932
মহ. সামসুদ্দিন চিস্তি

সেখ আকিব উদ্দিন
ইঞ্জি. ৩৬৭

সাফিউল আলম
ইঞ্জি. ৯০০

সেখ মহ. রাজিবুল
ইঞ্জি. ৯৬৬

অসিম আনোয়ার
ইঞ্জি. ১২৫০

সাইদুল ইসলাম
ইঞ্জি. ১৪৬৫

আসিদুল রহমান
ইঞ্জি. ১৬৯১

সেখ রিয়াজ
ইঞ্জি. ১৭১৯

ইজাজ আনোয়ার
ইঞ্জি. ২২৫৮